মা ও বাবার

শ্রীচরণে—

পূর্বভাষ

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বাঙলা কথাসাহিত্যের যে-ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে আধুনিক কাল পর্যন্ত, তার ঐশ্বর্য ও মহিমা আজ আর কারো অগোচরে নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—বাঙলা কথাসাহিত্যের এই তিন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের কথা বাদ দিলেও, এঁদের উত্তরসূরী যে আধুনিক কথাশিল্পীসমাজ, তাঁরাও নিতান্ত নগণ্য ন'ন। বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে এমন কয়েকজন কথাশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা সত্যই অসামান্য। জনপ্রিয়তার গৌরবে এঁদের প্রতিভা সম্বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু পাঠকসমাজের কাছ থেকে কেবল শ্রদ্ধা আর অভিনন্দনই শিল্পীর একমাত্র পাওনা নয়। আরও একটি পাওনা আছে তাঁর। সেটি হল, তাঁর সৃষ্টির বিস্তৃত অথচ অন্তরঙ্গ আলোচনা।

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের নিয়ে তেমন অন্তরঙ্গ আলোচনা খুব সামান্যই হয়েছে। এটা ক্ষোভের কথা। ইতস্ততঃ নানাগ্রন্থে যেটুকু আলোচনা হয়েছে, তার মধ্য থেকে কোন শিল্পী-বিশেষের মন ও শিল্প-রীতির স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠার অবকাশ পায়নি। কারণ সে সব ক্ষেত্রে সমালোচকের দৃষ্টি মুখ্যতঃ আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের চলমান স্রোতের দিকে। সেই সচল প্রবাহের নিছক এক একটি তরঙ্গ হিসেবেই কথাশিল্পীদের গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যের ওপর বেশী আলোকপাত করার অবকাশ সেখানে নেই।

বর্তমান গ্রন্থে সেই অভাব সামান্য পরিমাণে দূর করতে চেষ্টা করেছি। আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যের এক মহৎ শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন ও শিল্পরীতির বিশিষ্ট দিকগুলি নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

বিভূতিভূষণ সারাজীবনে অনেক উপন্যাস, অজস্র গল্প লিখে গেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি উপন্যাস ও কিছু ছোটগল্প-রচনায় তিনি আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু এমন অনেক উপন্যাস বা গল্প তাঁর আছে, যেগুলি শিল্প-বিচারে হয়ত একেবারেই ব্যর্থ মনে হবে। কিন্তু তবু বিভূতিভূষণ মহৎ শিল্পী। অবিস্মরণীয় এক কথাসাহিত্যিক। তাই তাঁর প্রতিভার

স্বরূপ-নির্ণয়ে তাঁর সমস্ত গ্রন্থের বিশদ আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছি। হয়ত' কিছুটা অনুচিত-ও। কারণ অসার্থক সৃষ্টির বিস্তৃত আলোচনা করে তাঁর প্রতিভার প্রতি হয়ত' অবিচার করব। পাঠকসমাজকে বিভ্রান্ত করব। তাই সে পথ আমি নিইনি। আমার মনে হয়েছে, তাঁর প্রতিভার আসল স্বরূপ পরিস্ফুট হবে, যদি তাঁর অন্তর্লোকের কয়েকটি বিশেষ চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করি। যে অভিনব নিগূঢ় চেতনা ও দৃষ্টির আলোয় তাঁর সমস্ত সাহিত্য উজ্জ্বল হয়ে আছে, এবং যা বাঙলা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান—এ গ্রন্থে তাদেরই কথা বলতে চেয়েছি।

আর সেদিক থেকে আমার মনে হয়, এ গ্রন্থ আয়তনে সংক্ষিপ্ত হ'লেও একেবারে অসম্পূর্ণ নয়। আর এই অসম্পূর্ণতা থেকে কতকটা মুক্ত হবার ইচ্ছাতেই শেষ তিনটি অধ্যায়ে বিভূতিভূষণের তিনটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নিয়ে পৃথক্‌ভাবে বিশদ আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এর ফলে পুনরুক্তি দোষ ঘটা স্বাভাবিক। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সে দোষ থেকে মুক্ত থাকতে। তবুও অনিচ্ছাকৃত সম্ভাব্য ত্রুটির জন্য আগে থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখি।

এ গ্রন্থ রচনায় অনেকের কাছ থেকে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি নানাভাবে। বিশেষভাবে, সক্রিয় সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অগ্রজ শ্রীঅমরনাথ রায়চৌধুরী, বন্ধুবর শ্রীঅনিল দাস, শ্রীঅরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়; এবং শ্রীদিব্যেন্দু রায়চৌধুরী, শ্রীমিহির দাশগুপ্ত, শ্রীমতী রেণুকা রায়চৌধুরী ও মালবিকা নাথ-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের ঋণ আমি আন্তরিক ভাবে স্বীকার করছি।

পরিশেষে, এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বুকল্যাণ্ডের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীজানকীনাথ বসুর প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আশুতোষ কলেজ : কলিকাতা
ডিসেম্বর : ১৯৫৯

গ্রন্থকার

সূচী

॥ সমকালীন পটভূমি ও জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ॥

বিংশ শতকের বাঙলা দেশ। তৃতীয় দশক। জীবনের সমুদ্র তখন তরঙ্গের আঘাতে ক্ষুব্ধ, ফেনিল। পুরনো পৃথিবীর প্রচলিত ঐতিহ্য আর বিশ্বাস, মনন আর মূল্যমান একটা প্রচণ্ড ভাঙন আর রূপান্তরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমের সভ্যতায় তখন নূতন প্রাণ-কল্লোল। বিপরীতমুখী চিন্তা আর তত্ত্বের সংঘাতে উদ্বেল, উত্তাল ভাববন্যা। সবে একটি বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছে, সামাজিক আর নৈতিক জীবনে তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এরি সঙ্গে এসে মিশেছে মার্ক্সের বৈপ্লবিক সাম্যনীতি আর ফ্রয়েডের যুগান্তকারী যৌনতত্ত্ব। পুরনো পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের স্বপ্ন আর স্থির-নিশ্চিন্ত আদর্শের সৌধটিতে ফাটলের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। একদিকে মানুষের ভাবজীবনের এই বিক্ষোভের ছবি, আর একদিকে অর্থাৎ বহির্জীবনে, শিল্প-বিপ্লবের ফলে যন্ত্রযুগের ক্রম-প্রসারের চিত্র। আর তারি ফলে সভ্যতার ভারকেন্দ্র সহজ গ্রাম-জীবন থেকে ক্রমশঃ সরে এসেছে নাগরিক জীবনে, যন্ত্রবদ্ধ কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশে।

পাশ্চাত্য জীবন ও সভ্যতার এই ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা এসে লেগেছে আমাদের আকাশে। আমরাও চঞ্চল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি। ক্রমশঃ আমরা জীবনের পূর্বতন প্রচলিত মূল্য সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হয়েছি, পুরনো ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার আর নীতিবোধ—সবকিছুকেই যুক্তির মর্মভেদী আলোয় নূতন করে যাচাই করে নিতে সুরু করেছি। দারিদ্র্যের মধ্যে আর ত্যাগের মহিমা চোখে পড়ে না, প্রেমের নামেই কোন অলৌকিক চেতনায় বিহ্বল হয়ে উঠিনে। সমস্ত কিছুকেই সাদা চোখে দেখবার, যাচাই করে নেবার এক নূতন নেশায় আমরা তখন মেতে উঠেছি।

বিংশ শতকের সুরুতে এই সংশয় জিজ্ঞাসা, এই to be or not to be-র হ্যামলেটীয় অস্থিরতা, বুদ্ধিজীবী মানুষের আদর্শের দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ, হতাশা

তীব্রতর হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের ধূমধূসর পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলা দেশে এর সঙ্গে মিশেছে রাজনৈতিক সংগ্রাম-চেতনা। মানুষের মন সমাজ ও যুগ-চিন্তার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত, বিক্ষুব্ধ হয়েছে বহুবিচিত্র ভাবে।

সাহিত্যকে বলা হয়েছে জীবনের দর্পণ। সেখানে যুগ ও জীবনের ছবি নানা রঙে, নানা রূপে নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। প্রথম যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্যে জীবনের অবক্ষয় আর সংশয়-জিজ্ঞাসার ছবি তাই স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেও জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত যত সমস্যারই চিত্ররূপ থাক না, যুগচেতনা সেখানে যতই পরিস্ফুট হোক না কেন, তবু তাদের পিছনে যে সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল, ছিল যে সমাজ-মানস, তা তখনও পর্যন্ত বিপরীত চিন্তা, সংশয় ও মূল্যবোধের আঘাতে আঘাতে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়নি। তার স্বরূপের অখণ্ডতা তখনও বিনষ্ট হয়নি। বাঙলার সমাজ-জীবন প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বযুগ পর্যন্ত পশ্চিমী নাগর সভ্যতার অবক্ষয়, রুগ্নতা, অসন্তোষ আর বিপর্যয় থেকে মোটামুটিভাবে মুক্ত ছিল, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। সাহিত্যেও তাই এই ছবি এর আগে এমনভাবে দেখা দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যে মৌলিক-চেতনার স্পর্শ এনেছিলেন সন্দেহ নেই, তাঁদের জীবনদৃষ্টির দীপালোকে মিশেছে য়ুরোপীয় ব্যক্তি-চেতনা বা সমাজ-চিন্তার ঊর্ধ্বমুখী শিখা। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য বা বিশ্বাসের কেন্দ্রমূল থেকে উন্মার্গচারী হননি।

কিন্তু তাঁদের প্রতিভায় যখন ক্লান্ত অবসাদের অস্পষ্ট ছায়া নেমেছে, চেতনায় জেগেছে যুগসন্ধির অস্থিরতা, যুদ্ধোত্তর জীবনের অজস্র সংশয়-জিজ্ঞাসা যখন উন্মুখ হয়ে সাহিত্যের আকাশে তার প্রকাশের ভাষা খুঁজে মরছে, তখন যে তরুণ লেখকগোষ্ঠী সেই সন্ধিকালের ভাব ও ভাবনাকে রূপ দিতে অগ্রণী হলেন, তাঁরাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোল-'কালিকলম-প্রগতি-গোষ্ঠী নামে খ্যাত। এই গোষ্ঠীর মধ্যে জ্যোতিষ্কের অভাব ছিল না। কিন্তু যুগ ও জীবনের অস্থির আবর্তের মধ্যে পড়ে এঁরা বিভ্রান্ত হয়ে আপন শক্তির অপচয় ঘটিয়েছেন। এইসব যৌবনপন্থী প্রগতিবাদী লেখকদের মধ্যে তখন জেগেছে নূতন ভাবোন্মাদনা, যুগের দারিদ্র্য-অভাবের অসহায় বেদনা আর নিরুদ্ধ দেহ-কামনার অসংযত আবেগ'ক সুস্পষ্ট বাস্তব রেখা-চিত্রে উৎকীর্ণ করে তুলতে হবে। পূর্বতন

যুগের অনুসরণে কেবল বিদেহী অধ্যাত্মবোধের অনুশীলন নিছক অর্থহীন ভাববিলাস মাত্র। বিশ শতকের মানবমুখী-যুক্তি ও বস্তুনির্ভর সভ্যতায় ওই ধরণের "আধ্যাত্মিক সাহিত্য" সৃষ্টির প্রয়াস মধ্যযুগীয় সংস্কার মাত্র; অতএব এই সুলভ আদর্শবাদ ও ভাববিলাসের মোহ ত্যাগ করে জীবনকে বাস্তবভাবে অনুভব করতে হবে। কল্লোলপন্থী এই লেখকগোষ্ঠী তাঁদের এই অভিনব প্রত্যয়ের শিল্পরূপ খুঁজে পেলেন না বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের মধ্যে। তাই তাঁদের আদর্শ হ'ল পশ্চিমী সাহিত্যঃ হামসুন, গোর্কী, বোয়ার।

এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে স্বীকার করেও যুগের প্রয়োজনে তাঁকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন কল্লোলপন্থীরা। তাঁরা নূতন যুগসৃষ্টির জন্যে যে সংগ্রাম করে গেছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু কল্লোল যুগের সাধনা যে পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেনি, তার কারণ কল্লোলপন্থীদের অন্তর্লোক সন্ধান করলেই পরিস্ফুট হবে। তাঁদের শক্তি ছিল, নিষ্ঠা আন্তরিকতা সবই ছিল। ছিল না কেবল বিশ্বাসের অখণ্ডতা। বিশ শতকের সভ্যতা যে সংশয়-জিজ্ঞাসার আঘাতে নিরন্তর পীড়িত হয়েছে, যে বিশ্বাসের দৈন্য হতাশা ও আত্মার অবক্ষয় এই যুগের চেতনাকে বিকলাঙ্গ করেছে—তাঁরা আমাদের তরুণ সাহিত্য-সাধকদের আত্মাকেও অস্থিরতার বেদনায় ব্যাকুল করে তুলেছিলেন। স্বভাবতঃ তাঁরা সবাই ছিলেন আদর্শবাদী, স্বপ্নবিহ্বল। কিন্তু যুগচেতনার প্রভাব এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বগ্রাসী' আধ্যাত্মিক চেতনার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা জীবনের স্বীকৃত আদর্শ ও মূল্যগুলিকে অবহেলা করে নূতন মূল্যমান প্রতিষ্ঠার দুষ্কর সাধনায় ব্রতী হলেন। বাইরের রুক্ষ কঠিন বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে আদর্শের সংগ্রাম আর বিশ্বাসের সংঘাত চলল তরুণ শিল্প-সাধকদের জীবনে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা কোথাও কোন স্থির বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারলেন না। কোন অখণ্ড, সমগ্র জীবনদর্শনও এঁদের রচনায় পরিস্ফুট হ'ল না। জীবনকে কখনও দেখেছেন মার্ক্সীয় সাম্যবাদের দৃষ্টিতে, কখনও ফ্রয়েডীয় যৌন-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। জীবনদৃষ্টিতে কোথাও প্রখর বাস্তবতা; কোথাও বা আশাহত আদর্শবাদীর স্বপ্নভঙ্গের আবর্ত। এ যুগের জীবনদৃষ্টি যতই সমাজ ও যুগ সচেতন হোক, যতই তা জগৎ ও জীবনের বিচিত্র উপকরণে সজ্জিত হোক না, তবুও তা খণ্ডিত একদেশদর্শী, এমন কি কোথাও কোথাও রুগ্ন, বিকৃত ও বিকলাঙ্গ। বিশ শতকের তৃতীয়

দশকের সাহিত্য—বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে কোন ভারসাম্য রাখতে পারেনি। যখনই তা বুদ্ধি ও মতবাদের সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করেছে, তখনই তার মধ্যে জীবনদৃষ্টির সমগ্র প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে। আর হৃদয়বৃত্তির পথে চলতে গিয়েও এ কালের সাহিত্য সহজভাবে পা ফেলতে পারেনি। কোথাওবা তা অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাসের রূপ নিয়েছে, কোথাও অন্ধ বিহ্বল আত্মরতি পরিণতি পেয়েছে শ্বাসরোধী 'মর্বিড' (morbid) আবেগে।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের বাঙলা সাহিত্যের এই পটভূমি। এই বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ প্রাণ-কল্লোল, সাহিত্যের এই খণ্ডবিশ্বাস, আর ক্ষুব্ধ হতাশ্বাস-চেতনার পটভূমিতে এসে দাঁড়ালেন বিভূতিভূষণ। অজস্র খণ্ডদৃষ্টির তরঙ্গ মন্থন করে আবির্ভূত হ'ল এক নূতন সমুদ্র-সম্ভব প্রাণ। সাহিত্যের আকাশ যখন ভরে উঠেছে নূতন সমাজ-চেতনায়, বিচিত্র বাস্তব জীবন সমস্যায়—সেই মুহূর্তে বিভূতিভূষণ নিয়ে এলেন এক শান্ত নির্লিপ্ত লিরিক সুরের নির্জন অবকাশ। বিক্ষুব্ধ জনজীবনের কর্ম কোলাহল থেকে অনেক দূরে পল্লীর নির্জন পথে ধূ ধূ-করা উধাও মাঠে, গহন রাত্রির নিঃসঙ্গ আকাশের তলায়, যেখানে সহজ শান্ত জীবনের আবেগমথিত গভীর সুরগুলি স্তম্ভিত হয়ে আছে, বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম উপন্যাসের (পথের পাঁচালী) অতি পরিচিত পটভূমিতে সেইগুলিকে প্রকাশ করলেন অলংকারহীন অথচ আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় এক ভাষায়। বাইরের পৃথিবীতে যেখানে অসংখ্য দ্বন্দ্ব-সমস্যা, জীবনের মূল্য পরিবর্তন নিয়ে মানুষের মন সংশয়ে জিজ্ঞাসায় উদ্‌ভ্রান্ত, সাম্যবাদ ও যৌনসমস্যা যখন বাঙলার মনন ও শিল্পপ্রেরণাকে আচ্ছন্ন করেছে—সেই সময় এই বিচিত্র মানুষটি দেশ কাল-বিস্মৃত এক আত্মবিহ্বল উদাসীন পথিক-শিল্পীর মত রূপকথার এক স্বপ্নমুগ্ধ অলৌকিক জগৎ রচনা করলেন। বাঙলা দেশের পাঠক ও লেখক সমাজ যুগপৎ বিস্ময়ে হতবাক্ হ'ল। বিভূতিভূষণ বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলেন। একটিমাত্র উপন্যাস রচনা করেই এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ—সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশী চোখে পড়ে না।

সমকালীন পটভূমি ও জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য

এক এক করে বিভূতিভূষণ অনেক গল্প আর উপন্যাস রচনা করলেন। প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যেই সেই যুগ ও সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত, উদাসীন, শান্ত, সহজ এক লিরিক মনের স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শ! পাঠক ও সমালোচকদের অনেকে অভিযোগ করলেন, বিভূতিভূষণের রচনা বিচিত্র গুণসম্পন্ন হলেও তা সমাজ ও যুগচেতনার স্পর্শরহিত। ঔপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তব জীবনধর্ম অপরিহার্য। জীবনের এই বাস্তব রূপকে যে কথাশিল্পী ফুটিয়ে তুলতে চান, তাঁর সাহিত্যে যুগ ও সমাজের সমস্যা ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে তো তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ যুগ ও সমাজের রূপের ভিতর দিয়েই তো ফুটে ওঠে জীবন, জীবনের বাস্তব চিত্রলিপি। বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যে জীবনের কঠিন বাস্তব সংগ্রামকে রূপ দেননি। তাঁর উপন্যাসের পটভূমিতে জীবনের কঠিন ধূসর পথের ছবি নেই, আছে আকাশ অরণ্য পাহাড়ের স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্য। তাঁর কাহিনীর নায়ক বাস্তব জীবনবাদী নয়, ভাবপ্রবণ স্বপ্নদর্শী। অতীত দিনের স্মৃতির ধূসর আকাশে কিংবা ভবিষ্যতের অলক্ষ্য কল্পদিগন্তে সে স্বপ্ন রচনা করে। অব্যবহিত বর্তমানের সঙ্গে তাঁর নায়কের কোন অন্তরঙ্গ যোগ নেই।

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে এটি প্রধান অভিযোগ। এ যুগের তিনি নাকি আরেক "নিরো"। বহ্নিমান রোমের মত আধুনিক যুগ ও জীবন অসংখ্য সমস্যার লেলিহান শিখায় দগ্ধ হচ্ছে। সেদিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। দূরকালের কোন্ অলক্ষ্য জগতের দিকে তাঁর দৃষ্টি বিসর্পিত। তারই স্বপ্নমোহে বিহ্বল হয়ে তিনি যেন অপার্থিব আনন্দ-ভৈরবী রচনা করে চলেছেন।

বিভূতিভূষণকে অনেকে পলাতক শিল্পী বলেছেন। তাঁদের স্বপক্ষে যুক্তি আছে। তাঁরা বলবেন বিভূতিভূষণ মনোধর্মে কবি। তিনি যদি তাঁর নিভৃত স্বপ্নলোকের নির্জন কাব্যের আধারে রূপ দিতেন, তাহলে বোধহয় তাঁকে নিয়ে এতো কথা উঠত না। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁকে এক পরম ভাববাদী, রোম্যান্টিক কবি বলে চিহ্নিত করতে কারো আপত্তি হতো না। কারণ নিবিড় প্রকৃতি-প্রেম ও অতীন্দ্রিয় চেতনাসমৃদ্ধ কবিকে পৃথিবীর মানুষ কখনো শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি।

কবির কাব্যবীণায় জীবনের আনন্দ-বেদনার সুর বাজে। কিন্তু তাঁর কাছে যুগ ও সমাজ-চেতনার দাবী তেমন উগ্র আর অপরিহার্য নয়। কবির

কাছে হৃদয়ের চিরন্তন সৌন্দর্য-পিপাসা আর রসোপলব্ধির সুর শুনতে যায় মানুষ। সাময়িক সমস্যা ও দুঃখ-অভাবের কথাগুলোকে সে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের দাবী স্বতন্ত্র। কেবল সৌন্দর্য-সন্ধানী, স্বপ্নদর্শী আর আবেগপ্রবণ হলে তাঁর চলে না, তাঁকে হতে হবে সমাজ-সচেতন, বিশেষ একটি স্থান-কালের পটভূমিতে তাঁর জীবনবোধকে উৎকীর্ণ করে তুলতে হবে। বিভূতিভূষণ যে যুগে জন্মেছেন, সেই যুগে সমস্যার অন্ত নেই। অথচ বলতে গেলে তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেই জটিল সমস্যামুখর যুগের ছায়ামাত্র পড়েনি। এর চেয়ে বিস্ময় আর ক্ষোভের কথা আর কী হতে পারে!

অভিযোগগুলি নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু পৃথিবীর সব উপন্যাস-বিচারের মাপকাঠি কখনও এক হতে পারে না। উপন্যাসের সঙ্গে জীবনের সংযোগ একেবারে প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত নিগূঢ়, কিন্তু সেই জীবনকে দেখার দৃষ্টিকোণ তো প্রত্যেকের স্বতন্ত্র। শরৎচন্দ্র যেভাবে জীবনকে দেখেছেন, তারাশংকর যেভাবে যুগকে উপলব্ধি করেছেন—সেটাই যে একমাত্র সত্য জীবনদৃষ্টি তা তো নয়। দেখার ভঙ্গী যার যে রকমই হোক না কেন, লেখকের সেই বিশেষ দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় যদি জীবনরহস্যের কোন অংশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—তখনই সেই জীবনদৃষ্টিকে সত্য বলে স্বীকার করবো। সত্য বলতে কি, আধুনিক উপন্যাসের কোন বাঁধাধরা চেহারা নেই। টুর্গেনিভের লিরিকধর্মী উপন্যাসকেও যেমন আমরা সার্থক সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছি, তেমনি আবার জয়েস ও হাক্সলীর উদ্ভট মনস্তত্ত্বসম্মত বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাসগুলিকেও কথাসাহিত্যের নূতন দিক-নির্দেশক বলে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছি।

বিভূতিভূষণকে আমরা অনেকে সমাজ চেতনাহীন, স্বপ্নদর্শী ও নিছক নির্জন প্রকৃতি-সৌন্দর্যের রূপকার বলে জেনেছি। তাঁর উপন্যাসের ভিতর জীবনবোধের কোন দৃঢ় সুস্পষ্ট অঙ্গীকার খুঁজে পাইনি।

কিন্তু এ ধারণা মূলতঃ সত্য নয়। বিভূতিভূষণ কেবল প্রকৃতির রূপ-সন্ধানী এক স্বপ্নদর্শী রোম্যান্টিক কবিসত্তা নন। প্রকৃতির প্রাণসত্তা অন্বেষণ কিংবা তার মহিমা মাধুর্য আবিষ্কার করাই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। প্রকৃতি তাঁর চোখে এই বৃহৎ বিশ্বসৃষ্টির একটি খণ্ড অংশ মাত্র। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে জীবনসাধক বিভূতিভূষণ সেই আশ্চর্য সৃষ্টিমহিমাকেই উপলব্ধি

করতে চেয়েছেন। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তিনি জীবন-পলাতকের মতো স্বপ্ন-কল্পনার অবাস্তব নীড় রচনা করতে চাননি। প্রকৃতির অন্তর্লোকে অবগাহন করে তিনি জীবন ও জগতের মহান সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছেন। জীবনকে তিনি খণ্ড ক্ষুদ্র রূপে, একটি বিশেষ দেশকালে বিধৃত করে দেখেননি। 'অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ-ব্যাপী জীবনের যে চলমান প্রবাহ, তারি মধ্যে তিনি জীবনের সত্য সমগ্র রূপের আভাস পেয়েছেন।' কোন বস্তুকে নিকট থেকে খণ্ড ভগ্নাংশরূপে দেখাই যে একমাত্র সত্য, তা নয়; দূর থেকে সমগ্রভাবে দেখার মধ্যেও বস্তুর সত্য পরিচয় নিহিত থাকে। বিভূতিভূষণ জীবনকে হয়ত সব সময় কাছে থেকে দেখেননি, তার খণ্ডিত পঙ্কিল পঙ্গু রূপটির পরিচয় হয়ত তিনি পাননি, কিন্তু জীবনের অন্তর্লোকে প্রবেশ ক'রে তার অখণ্ড আত্মার সন্ধানে তাঁর মন উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। (জীবনকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তিনি প্রকৃতির সাহচর্য কামনা করেননি, বরং জীবনকে আরও গভীর আরও সত্যরূপে অনুভব করার জন্যই তার সান্নিধ্য চেয়েছেন।) জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্য রচনার নানাস্থানে প্রকাশ পেয়েছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসের এক জায়গায়, অমরকণ্টক যাবার পথে মধ্যপ্রদেশের এক অতি-নির্জন আরণ্য-পার্বত্যভূমির মধ্যে পথ চলতে চলতে অপুর মনে জীবন সম্পর্কে যে উপলব্ধি জেগেছে, তা লেখকেরই নিজস্ব জীবনদর্শন: "যে জগতকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেঁয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা, সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন-গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে, দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্তজীবনের উৎসধারা।"—বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলি এই 'পরিপূর্ণ' 'সৌম্য', 'শাশ্বত' জীবন-চেতনারই বিস্তৃত ভাষ্য। মানবচরিত্রের দুশ্ছেদ্য জটিলতা বা রহস্যমোচনের প্রতিভা তাঁর নেই—যা কথাসাহিত্যিকের প্রধান সম্পদ। অসংখ্য মানুষের চরিত্র-রহস্য উপলব্ধি করে, প্রাত্যহিক জীবনের বহু বিচিত্র সমস্যা মন্থন করে তাঁর জীবনদর্শন গড়ে ওঠেনি। তা মুখ্যতঃ গঠিত হয়েছে তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে: (ক) প্রকৃতি চেতনা, (খ) চলমান মহাকালের বিরাট স্বরূপের উপলব্ধি ও অতীত দিনের স্মৃতিরস, এবং (গ) অধ্যাত্ম বিশ্বাস।

উপরিউক্ত তিনটি উপাদানের নিবিড় সংযোগে যে জীবনদর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, তাকে জীবনবিমুখ বলে নিন্দা করলে, জীবনের সংজ্ঞা সম্পর্কে খণ্ডিত ও বিকৃত ধারণারই পরিচয় দেওয়া হবে। বিভূতিভূষণ আদৌ জীবনবিমুখ মন, বরং বিশ্বলোক ও মহাকালের বিশাল পটভূমিতে মানবজীবনকে নিরীক্ষণ করে, সৃষ্টির বিস্ময়কর মহিমা ও মানব জীবনের অমেয় ঐশ্বর্যকেই তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকী বাংলা সাহিত্যে যখন যুদ্ধোত্তর হতাশা, বিভ্রান্তি ও সংশয়-জিজ্ঞাসার দুঃসহ অস্থিরতা ও গ্লানিবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে বিভূতিভূষণ নিয়ে এলেন জীবন সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাস ও অখণ্ডতার নিগূঢ় উপলব্ধি। বুদ্ধি-বিশ্লেষণ মননের সংকীর্ণ পথ ছেড়ে তিনি এলেন হৃদয়ধর্মের সহজ সমন্বয়বাদী পথে। সেই সহজ অধ্যাত্ম বিশ্বাস ও বিশ্বজীবনের মহান উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই, নিজেকে তিনি মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন যুগধর্মের সংকীর্ণতা ও হতাশার অবক্ষয়-আবর্ত থেকে।

তিনি মানুষকে কোন বিশেষ মতবাদ বা সমস্যা-জটিলতার মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলেন না। অবশ্য মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যকে তিনি স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু তবু তিনি বললেন যে মানুষ তুচ্ছ সংকীর্ণ নয়, দুঃখ-বেদনার কঠিন অগ্নিতপস্যার মধ্যেও মানুষের আত্মা অপরাজিত। সে সীমাহীন শাশ্বত আনন্দের অধিকারী। মনুষ্যত্বের স্তোত্রগানে তাঁর সাহিত্য মুখর হয়ে উঠেছে। দুঃখকে তিনি পথের বাধা বলে স্বীকার করেননি কোথাও। দুঃখ তাঁর কাছে "অমৃতত্বের পাথেয়" বিশেষ। তাঁর অমৃতসন্ধানী আত্মা জীবনের শত দুঃখ-দুর্যোগের সমুদ্রসম্ভব সমস্ত বিষটুকু নিঃশেষে পান করে আর্ত নিপীড়িত মানুষের কাছে তুলে ধরেছে বিশ্বাস ও মানবমহিমার অমৃতভাণ্ড। জীবনের দুঃখ-বিপর্যয়ের দিনগুলোকেই তিনি পরম সত্য বলে মেনে নেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাইরের আকাশে যখন বিপর্যয় আর দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসে, তখনও মানুষের সহজ আবেগ অনুভূতিগুলি মরে যায় না। সাধারণ মানুষের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের কাহিনী তখনও রচিত হতে থাকে পাড়াগাঁর দীপজ্বালা আধো আলো-ছায়া, শান্ত নিরালা গৃহকোণে। যে 'central peace subsisting at the heart of endless agitation,'— জীবনের সেই মূল কেন্দ্রবিন্দুটির সন্ধান

পেয়েছিলেন শিল্পী বিভূতিভূষণ। হার্ডির সেই অতি বিখ্যাত লিরিকটিতে রাজ্য ভাঙা-গড়ার সন্ধিমুহূর্তে সাধারণ চাষী-মজুর তরুণ-তরুণীর জীবনের সহজ নিরুদ্বেগ প্রবাহের যে ছবি আছে, বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্যে যেন তারই সুদৃঢ় সমর্থন মেলে। অপু, দুর্গা, যুগলকিশোর, ভানুমতী, নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া, মঞ্চী, জিতু, নিশ্চিন্দিপুর, ইছামতী, মহালিখা পাহাড়, নাঢ়া বইহার—সব মিলিয়ে লেখক যে গভীর উপলব্ধি আমাদের মনে সঞ্চারিত করে দেন, যে বিপুল শান্তি ও জীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম-চেতনায় আমরা আশ্বস্ত হই—তার জন্য লেখককে সমাজ-সচেতন না বলি, জীবননিষ্ঠ মহান্ শিল্পীর স্বীকৃতি দেবো নিশ্চয়ই।

বিশ শতকের যে পর্বে বিভূতিভূষণ আবির্ভূত হলেন, সেই সময়কার সাহিত্যের পটভূমি আমরা আলোচনা করেছি। সেই যুগের সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব-কণ্টকিত, মার্ক্স-ফ্রয়েডের অনুকরণে রচিত উগ্র-বাস্তবমুখী সাহিত্যের জমিনে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' 'আরণ্যকে'র মতো ফসল উৎপন্ন হল কেমন করে—এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে। 'বেদে' 'সাড়া' বা 'পাঁকে'র পটভূমিতে 'পথের পাঁচালী' রচিত হ'ল কেমন করে, বাঙালী পাঠকের কাছে আজও এ এক বিস্ময়। বিভূতিভূষণকে অনেকেই তাঁর সমকালীন সাহিত্যের আকাশে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। সে যুগের উত্তরঙ্গ ফেনিল আবর্তের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ছিল না। তিনি যেন অন্য কোন জগৎ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মতো হঠাৎ এই যুগের মধ্যে এসে পড়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে এ রকম ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রই তাঁর সমকালীন পটভূমিতে ব্যতিক্রম বিশেষ। সাধারণের ভীড়ে তাঁরা হারিয়ে যান না বলেই সহজেই তাঁদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই অর্থে বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য, সাহিত্যিক ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য সে যুগের একমুখী প্রবাহের সঙ্গে কিছুতেই মিলতে পারে না। সবাই যখন একসুরে গলা মিলিয়েছে,

তখন তাঁর সুরের স্বাতন্ত্র্য, অভিনবত্ব (যতই শান্ত, অনুচ্চ হোক না সে সুর) তাঁর মহিমাই প্রকাশ করেছে।

• আমরা ঠিক সে কথা বলছি না। বলছি ঐতিহ্যের কথা। সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের কথা। বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে ধারা বহন করে এনেছেন, তা মূলতঃ রোমান্স ও আদর্শবাদের ভাবরসে পুষ্ট। উনিশ শতকের অপেক্ষাকৃত শান্ত, নিরুদ্বেগ সমাজ-চেতনার পটভূমিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত স্বাভাবিক ছিল। দুঃখ দৈন্যের হাহাকার কিংবা অভিনব মতবাদের জন্য তখনও জীবনের মূল্যমানগুলির পরিবর্তন ঘটেনি তেমনভাবে। তাই প্রচলিত রীতি অনুসারে হৃদয় ধর্মকেই মুখ্য সম্বল করে উনিশ শতকের উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে দেশ ও কালের চেহারা পাল্টিয়েছে। সেই সঙ্গে সাহিত্যেরও। শরৎচন্দ্রের মধ্যে জীবনের সেই পরিবর্তিত মূল্যবোধের কিছু কিছু প্রকাশ দেখেছি। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখবেদনা তাঁর সংবেদনশীল মনকে স্পর্শ করেছে। সমাজের মৌলিক ত্রুটি, নরনারীর প্রচলিত নীতিবোধ—এসব সম্পর্কে তিনি অজস্র জটিল প্রশ্ন তুলে ধরেছেন সমাজের কাছে—অসংখ্য বাস্তব চিত্র ও ঘটনা-সংস্থানের মাধ্যমে। কিন্তু তবু শরৎচন্দ্র মূলতঃ হৃদয়ধর্মী শিল্পী। তাঁর এই সুগভীর হৃদয়ধর্মই শেষ পর্যন্ত তাঁকে আদর্শবাদী করে তুলেছে। সমাজ জীবন ও প্রেম সম্পর্কে তাঁর আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে তাঁর নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় অবসাদের চিহ্ন দেখা দিতেই বাঙলার সাহিত্য জগতে প্রবল প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। এতদিনের রোমান্স ও আদর্শবাদের একটানা মাধুর্যরস সম্ভোগের পর লেখক ও পাঠকগোষ্ঠী হঠাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় বাস্তব-সচেতন হয়ে উঠলো। একদিকে সাম্যবাদ, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও যন্ত্রযুগের প্রসার, অন্যদিকে একটানা আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া—সব কিছু মিলে এক ধরণের বুদ্ধিপ্রধান উগ্র ও কতকটা নগ্ন বাস্তববাদের সূচনা হল কথাসাহিত্যে। "কল্লোল-কালিকলম" গোষ্ঠীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই উগ্র বাস্তব চেতনার ঝাঁঝালো পানীয়টুকু প্রথম প্রথম অনেকেই বেশ সাগ্রহে আস্বাদ করেছিলেন। কিন্তু পাঠককে বেশীদিন তৃপ্তি দিতে পারলো না এই ধরণের সাহিত্য। এই একঘেঁয়ে হতাশা, সংশয়-জিজ্ঞাসা,

আর ভঙ্গুর সমাজজীবনের বুকচাপা কান্না—মানুষের মনে দুর্বহ বোঝা হয়ে তার মনে আবার একটি অন্তর্বাহী প্রতিক্রিয়ার স্রোত প্রবল হতে লাগল। সেই স্রোত মানুষকে জীর্ণতর জীবনের গভীরতর হতাশা অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে গেল না, নিয়ে গেল এই রূপ-রসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীরই এক গভীরতর অন্তর্লোকে, যেখানে অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির পথে মেলে জীবনের আশা-আনন্দের সঞ্জীবনী অমৃতরস।
নগ্নবাস্তববাদের বিরুদ্ধে নূতন এক প্রতিক্রিয়ার প্রবাহকে বহন করে আনলেন। বাঙলাদেশের পাঠকগোষ্ঠীর মনের এক গোপন প্রত্যাশাকে তিনি ভাষা দিলেন। যে আদর্শবাদের প্রবাহ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পর ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে আসছিল, বিভূতিভূষণ তাকেই আবার সঞ্জীবিত করলেন। অবশ্য তাঁর আদর্শবাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল নিশ্চয়ই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে অতীন্দ্রিয় রহস্য, আনন্দের ব্যঞ্জনা এর আগে আর কারও উপন্যাসে এতখানি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশ পায়নি। সমস্ত দুঃখ-বেদনা ও লাঞ্ছনার মধ্যেও অপরাজিত মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের গৌরব-গাথা তাঁর আগে বাঙলা উপন্যাসে তেমনভাবে আর শিল্পরূপ পায় নি।

এতক্ষণ সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের ধারাটি বিচার করে দেখা গেল যে বিভূতিভূষণ বাঙলা সাহিত্যের কোন ব্যতিক্রম নন। সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি প্রবাহেই তিনি এসেছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্য সেই ধরণের এক প্রতিক্রিয়ারই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ফলশ্রুতি।

ভারতীয় জীবনবোধ ও শিল্পচেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গীর এক আশ্চর্য সংগতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসের যদি রসবিচার করা যায়, তাহলে বলতে হয় তাঁর সাহিত্য শান্ত রসাশ্রিত। জীবনের এমন একটি সুবলয়িত রূপ তিনি আপন ধ্যানদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন, যেখানে জীবনের সমস্ত কলহ সংশয় ও স্বার্থদ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। ভারতীয় জীবন ও সাহিত্য সাধনার মূল কথাটিও তাই। ভারতবর্ষ কোনদিন দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়কে জীবনের শেষ পরিণাম ও সত্য বলে স্বীকার করে নেয়নি, তাই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে মর্মদাহী ট্রাজেডির কোন স্থান নেই। ভারতবর্ষের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যের মর্মমূল থেকে একটিমাত্র রসের প্রবাহ উৎসারিত—সেটি স্নিগ্ধ

গভীর শান্তরস। ভারতবর্ষের ও ভারতীয় সাহিত্যের এই চিরন্তন সুমহান বৈশিষ্ট্যটিই বিভূতিভূষণের সাহিত্যে স্থায়ী অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে।

সুতরাং বিভূতিভূষণ সম্পর্কে যে আত্মকেন্দ্রিকতার অভিযোগ উঠেছে, বলা হয়েছে যে তিনি সমষ্টি জীবনের শিল্পী নন, কেবল নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়েই জগৎ ও জীবনকে সীমাবদ্ধ করে দেখেছেন,—বিশ শতকের সাহিত্যিক হয়েও তিনি সমকালীন সচল শিল্পধারার অনুসরণ করেন নি—এ সমস্ত অভিযোগ খুব যুক্তিসহ ঠেকে না। হয়ত সমকালীন সাহিত্যধারার অনুসরণ তিনি করেন নি, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় যে অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তা আমাদের দেশের চিরন্তন সাহিত্যিক ঐতিহ্যেরই একান্ত অনুসারী। আর সেই অর্থে তিনি নিজেও ভারতীয় অখণ্ড জীবনদৃষ্টিরই মহান উত্তরসাধক।

॥ প্রকৃতিচেতনা ॥

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যের মহত্ত্ব বিচার করতে গিয়ে ব্রাডলে একটি আকর্ষণীয় উক্তি করেছিলেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যে মহৎ কবি, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ব্রাড্লে বলেছিলেন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের এই কাব্য-মহিমার পেছনে আছে তাঁর আশ্চর্য মৌলিকতা। তাঁর চেয়ে মৌলিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোন কবি নাকি জন্মান নি। এবং যখন "Originality is an element in all greatness"—তখন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মহত্ত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

উক্তিটির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে কি নেই, সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবাস্তর। এর ভিতরে একটি সত্য আছে, সেটিকে শুধু আমরা গ্রহণ করব। সাহিত্যের ইতিহাসে বারবার চোখে পড়েছে একটি ঘটনা। শক্তিশালী কোন্ নূতন লেখক যখন সাহিত্যের জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর রচনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টিকে অনিবার্য ভাবে আকর্ষণ করেন, তখন একথা নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে, সে লেখক তাঁর চিন্তায়, উপলব্ধিতে বা তাঁর শিল্পপদ্ধতিতে এমন কিছু নিয়ে এসেছেন, যা পূর্বআচরিত কোন মামুলি বস্তু নয়, যা ঐতিহ্যকে স্বীকার করেও তাকে কোন না কোনও ভাবে অতিক্রম করে গেছে, আপন স্বাতন্ত্র্যের জোরে।

পৃথিবীর যে কোন মহৎ শিল্পীর রচনাই এই মৌলিক চেতনার আলোয় উজ্জ্বল।

বিভূতিভূষণ মহৎ সাহিত্যস্রষ্টা কিনা, সে প্রসঙ্গ এখানে তুলব না। সে-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, জানি; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ যে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তার প্রধানতম কারণ যে তাঁর সৃষ্টির অনন্যসাধারণ মৌলিকতা—এ কথাও তো অস্বীকার করা যায় না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এই অপ্রত্যাশিত স্বাতন্ত্র্য তাঁর সাহিত্যকে তাঁর পূর্বসূরী ও সমকালীনদের রচনা থেকে সম্পূর্ণ অভিনব বলে চিহ্নিত করেছে।

কিন্তু বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মৌলিক উপাদানটি কী? মানুষকে আশ্রয় করেই তো উপন্যাস গড়ে ওঠে। মানুষের জীবন, তার আশা-

আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার আপাত-তুচ্ছ অনুভূতিগুলিকে নিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনীর বিচিত্র বর্ণজাল বুনে চলেন, নরনারীর চরিত্রের অতলান্ত সমুদ্র থেকে তিনি তুলে আনেন জীবনরহস্যের গোপন মণিখণ্ড।

ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বাদ দিলে সমগ্র উনিশ শতকের ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস মোটামুটি ভাবে নীড়াশ্রয়ী গৃহজীবনের কাহিনী। সেখানে যাদের সুখদুঃখ তুচ্ছতা-মালিন্য-মহত্বের কথা লেখক বলেছেন তারা নিছক গৃহস্থ মানুষ। 'স্বর্ণলতা' থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের যে ধারা, তাতে বাস্তবধর্মী পারিবারিক উপন্যাসেরই প্রাধান্য। উপন্যাসের যে প্রধান সম্পদ তার মানব-চেতনা, তার বাস্তব ধর্ম, সেই সমস্ত গুণই এই সব উপন্যাসে বর্তমান।

শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের গৃহজীবনের যে সুখদুঃখের ছবি এঁকে গিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে বাংলা দেশ তার চিরন্তন রস-জীবনকে খুঁজে পেয়েছে। পারিবারিক জীবনের সমস্ত বেদনা-মাধুর্য তাঁর সাহিত্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে আশ্চর্য সজীবতা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের শিল্পসাধনায় যখন অবসাদের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন বাংলা সাহিত্যের আসরে দেখা দিয়েছে বিক্ষুব্ধ-প্রাণ, সংগ্রাম-সংশয়-বিহ্বল কল্লোলপন্থীরা। ফ্রয়েড, মার্ক্স ও রাজনৈতিক আবর্ত-আবিলতার প্রভাবে তাঁদের ঝাঁঝালো সাহিত্য দেশের মধ্যে একটা আলোড়ন এনেছে। আর ঠিক—এই উত্তাল উত্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্য থেকে শান্ত ও মধুর সামগ্রিক জীবনবোধের বাণী বহন করে নির্জন এক দ্বীপের মত জেগে উঠলেন—বিভূতিভূষণ। কল্লোল-পন্থীদের জীবনবোধের মধ্যে ছিল একটা ভাঙনের সুর। জীর্ণ, পঙ্গু সংস্কারকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে তখন তাঁরা পথে নেমেছেন। তাঁদের চোখে তাই গৃহজীবনের স্বপ্নাবেশ নেই। সে দৃষ্টিতে যাযাবর জীবনের ধূসরতা।

বিভূতিভূষণ কিন্তু কল্লোলীয় জীবনদৃষ্টির বিপরীত প্রতিক্রিয়ার শিল্পী। তিনি কোন কিছু বদলাতে চাননি, কিছু ভাঙতে চাননি। তিনি জীবন-চেতনায় যাযাবর নন। নীড়াশ্রয়ী গৃহী। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' থেকে শেষ গ্রন্থ পর্যন্ত বেশীর ভাগ রচনাতেই গ্রাম-বাঙলার পারিবারিক জীবনের রসমাধুর্যের ছবিই বিচিত্র রেখায় ফুটে উঠেছে।

তাঁর সাহিত্যে বাংলা দেশের গৃহজীবনের যে ছবি আছে, স্বীকার করলাম তা মনোরম। হয়তো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু এতো বাস্তব। পল্লী বাঙলার

গৃহজীবনের আনন্দ-বেদনার চিরন্তন ছবি যত সুন্দর রেখাতেই তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠুক না কেন, উনিশ শতকের মধ্যকাল থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাসের ধারা-লক্ষণ বিচার করে তাকে আর যাই বলি, মৌলিক বা অভিনব বলতে পারব না নিশ্চয়ই। হরিহর রায়, সর্বজয়া, জিতুর মা, জ্যাঠাইমা, বিভূতি-ভূষণের উপন্যাসের এই সব সুপরিচিত নরনারী, এঁরা চরিত্র হিসেবে যতই সজীব হোন না কেন, বাংলা উপন্যাসের জগতে এঁরা কেউ-ই নবাগত নন, পূর্বপরিচিত মানুষেরই প্রকারভেদ মাত্র। নিছক চরিত্রসৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রকে অতিক্রম করে বেশীদূর এগোতে পারেন নি। অথচ একথাও তো সত্য যে বিভূতিভূষণের একখানা উপন্যাস পড়ার পর কখনো এ কথা মনে হয় না যে, এ নেহাতই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অনুসরণ বা অনুকরণ মাত্র। কী যেন এক অভিনব রসচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে পাঠকের মন অপরূপ আনন্দলোকের স্পর্শ পায়। সেই রস-ব্যঞ্জনার রহস্যময় গোপন উপাদানই হলো—প্রকৃতি। প্রকৃতিচেতনা।

লেখকের তথাকথিত বর্ণবিরল, তুচ্ছ কাহিনীর ওপর যখন আকাশ-মাটি-অরণ্যের মুগ্ধ ছোঁয়া লাগে—যখন প্রতিদিনের চেনা মানুষ, ও তাঁদের সুখ দুঃখের ওপর প্রকৃতির অন্তরশায়ী সজীব সত্তার ছায়া পড়ে—তখনই বিভূতি-ভূষণের রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আমাদের মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

পুরনো সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যে প্রকৃতির প্রাণময়ী সত্তা ও সৌন্দর্যের প্রভাব তাঁর পূর্বে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রকৃতিচেতনার বিচিত্র বিবর্তন আমরা সাগ্রহে প্রত্যক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রকৃতিচেতনার যে সমন্বয়, তা তাঁর কাব্যে অনন্যসাধারণ রূপ লাভ করেছে।

কিন্তু বাংলা উপন্যাসে বিভূতিভূষণের আগে এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রকৃতিকে এত বড় ভূমিকা দেবার দুঃসাহস কেউ কখনও করেন নি। প্রকৃতিকে যিনি সারা জীবন মর্মসহচরী করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপন্যাসের জগৎ থেকে প্রকৃতিকে একরকম নির্বাসিত করে রেখেছিলেন বলা চলে। (গল্পগুচ্ছের কয়েকটি ছোট গল্পে কেবল তাঁর এই প্রকৃতিপ্রেমের স্বাক্ষর আছে)। রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তর-সাধক হিসেবে বিভূতিভূষণ বাংলা উপন্যাসে প্রকৃতিচেতনার নিগূঢ় রসোপলব্ধিকে সঞ্চারিত করে বাংলা

উপন্যাসের সম্মুখে একটি বিরাট সম্ভাবনার জগৎ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সে-দিক দিয়ে তিনি বাংলা উপন্যাসের কেবল এক মহৎ শিল্পী নন, নূতন পথিকৃৎও বটে।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার রহস্যময় পথ-পরিক্রমায় অভিযানের আনন্দ আছে। সে পথ রূপ-লোক থেকে অতীন্দ্রিয় অরূপ-বিশ্বের দিকে দূর-বিসর্পিত। সেই ব্যাপক অথচ গভীর এক বিস্ময়কর চেতনার বিশিষ্টতায় একদিকে বিভূতিভূষণ মহৎ কবি, অন্যদিকে নরনারীর প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের আপাত-তুচ্ছ কাহিনীর সঙ্গে প্রকৃতির রসমাধুর্যের সমন্বয়-সাধনে তিনি এক অসাধারণ কথাশিল্পী। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে হলে তাই কবি আর কথাশিল্পী—লেখকের এই দ্বৈত সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে। অনুভবের গভীরতায় যাকে তিনি একান্ত গভীর ভাবে জেনেছেন, তাকে তিনি উপন্যাসের বিশিষ্ট আধারে কতখানি ধরে দিতে পেরেছেন—তারই আলোচনায় নির্ধারিত হবে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনার সত্যকার বৈশিষ্ট্য

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে যে একটি অতিপ্রচলিত অভিযোগ শোনা যায়, তিনি নাকি যুগ-সচেতন নন, বাস্তব জীবননিষ্ঠা তেমন ভাবে তাঁর উপন্যাসে নাকি ফুটে ওঠেনি—এ সব-কিছুরই মূলে খুব স্পষ্ট একটি কারণ আছে—তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির ভূমিকা। উপন্যাসের আশ্রয় মানুষ—মানুষের জীবন আর চরিত্র। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে অনেকক্ষেত্রেই মানুষের প্রভাব ও স্বাতন্ত্র্যকে অতিক্রম করে রহস্যময়ী প্রকৃতির আশ্চর্য রূপকান্তি, তার অন্তর্লীন প্রবল প্রাণসত্তা এবং তার রহস্যময় পথ বেয়ে অধ্যাত্মচেতনার লোকোত্তর স্পর্শ—এরাই নাকি প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে তাঁকে আধুনিক যুগ ও জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ কথাশিল্পী বলা চলে না—এই হল অভিযোগ-কারীদের সরল গাণিতিক সিদ্ধান্ত। বর্তমান প্রবন্ধ ঠিক এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র নয়, তবু এটুকু নিশ্চয়ই বলব যে সাহিত্য ঠিক গণিতের ছকবাঁধা হিসেব নয়। ঔপন্যাসিকের যেমন কতকগুলি শিল্পরীতির বন্ধন

ও নীতিগত দায়িত্ব আছে, তেমনি আবার অনেকখানি স্বাধীনতা আর অধিকারও আছে। কোন উপন্যাসে কোন উপাদান ঠিক কী অনুপাতে থাকবে, তা কেউ স্থির করে দেয় না। জীবনশিল্পী লেখকের সহজ অনুভূতির নিশ্চিত আলোয় তা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সব ঔপন্যাসিককেই কখনও এক ছাঁচে ফেলে বিচার করা চলে না। প্রত্যেকেরই কতকগুলি সহজাত প্রবণতা থাকে। শৈশবে তা সবেমাত্র অংকুরিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে যত দিন যায়, জীবনের বিচিত্র পথের আলো-বাতাসের স্পর্শে তার প্রকাশ ক্রমশঃ স্ফুটতর হতে থাকে। বিভূতিভূষণের পক্ষে প্রকৃতি-প্রবণতা এই দিক থেকে একান্ত ভাবে সহজাত। সুতরাং এই প্রকৃতিপ্রবণ ঔপন্যাসিকের রচনায় প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জীবনের নূতন ভাষ্য যদি আমাদের চোখে পড়ে, তবে তাকে অবাস্তবতার দোষে দুষ্ট কল্পনাবিলাসী উপন্যাস বলে অবজ্ঞা করব কোন্ যুক্তিতে? বিভূতিভূষণের তুলনা খুঁজে পাইনি বলেই কি তিনি আধুনিক বাস্তবধর্মী উপন্যাসের আসরে অপাংক্তেয় হয়ে থাকবেন? সমুদ্র, আকাশ, অরণ্য—যা কিছু অসামান্য, কারোরই তো তুলনা নেই। প্রকৃতি আর মানুষের সমন্বয়বাদী-শিল্পী বিভূতিভূষণ সেই অনুপম অসামান্য প্রতিভার অধিকারী।

আর একটি কথা। পৃথিবীর সাহিত্যে প্রকৃতি সেই কোন্ বিস্মৃতকাল থেকে স্থান পেয়ে এসেছে। আদিম পৃথিবীর সঙ্গে তার ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধন। তখন নগর ছিল না, সভ্য মানুষ ছিল না, নাগরিক জীবনের এত বিচিত্র উপকরণের সামান্য ভগ্নাংশও ছিল না। ছিল শুধু আকাশ, অরণ্য, পাহাড়, আর ধূ ধূ মাঠ। এই প্রকৃতিই ছিল তখন শিল্প-প্রেরণার প্রধানতম উপকরণ। তারপর প্রাচীন সভ্যতার ক্রমশঃ উদ্ভব হয়েছে, মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তখনও কাব্যে, গানে, গল্পে প্রকৃতি অসীম প্রভাব বিস্তার করে আছে। রামায়ণে, শকুন্তলায়, মেঘদূতে, উত্তররামচরিতে প্রকৃতি চেতনার অজস্র স্বাক্ষর।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা যাবে যে প্রকৃতি নিতান্ত আধুনিক কালের শিল্প-উপাদান নয়। সুতরাং বর্তমান কালের যে শিল্পী প্রকৃতিকে তাঁর উপন্যাসে এতখানি প্রাধান্য দিয়েছেন—তিনি শিল্পীর গোত্রবিচারে ঠিক আধুনিক নন। একথা মনে হওয়া অসংগত নয়। জীবন যেখানে বিচিত্র সমস্যায় আকীর্ণ, মানুষের চরিত্ররহস্য যেখানে গহন অরণ্যের মত জটিল হয়ে উঠেছে—সেখানে সে সমস্ত অবহেলা করে প্রকৃতির

লীলারসে ডুবে থাকা আর যাই হোক আধুনিক জীবনধর্মী কথাশিল্পীর পক্ষে অন্ততঃ গৌরবের বিষয় নয়।

অভিযোগ ত এই। কিন্তু এরও জবাব আছে। মানুষের চরিত্রের একটা আশ্চর্য রহস্য এই যে, সে কখনও চিরকালের জন্য কোন এক প্রান্তে চরমভাবে ঝুঁকে পড়তে পারে না। শেষ পর্যন্ত তুলাদণ্ডের মত ভারসাম্য বজায় রেখে চলবার চেষ্টা সে করবেই। মাঝে মাঝে অবশ্য মত্ততা জাগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি আসে, আসে আত্মগ্লানি, তা থেকে কিছু আত্মবিচার। শেষে আবার সেই ভারসাম্যের প্রয়াস। এইটিই মানুষের চিরদিনের ইতিহাস—যুগ ও জীবনের এইটিই পরীক্ষিত সত্য। তাই দেখি ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) পাশাপাশি চলেছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীটসের "রোমান্টিক রিভাইভ্যাল" এবং কাব্যে প্রকৃতিচেতনার পুনঃপ্রবর্তন। জীবনকে যন্ত্রের যূপকাষ্ঠে যাতে বলি দিতে না হয়—সেজন্য মানুষ যন্ত্র-নির্ভর নাগরিক জীবনের পাশাপাশি প্রকৃতির রূপ-রসের নিবিড় আস্বাদও পেতে চেয়েছে। এ শতাব্দীতে তাই কলকারখানা ও যন্ত্র-জীবনের জটিল সমস্যা যেমন সাহিত্যের আধুনিকতম উপাদান, তেমনি যন্ত্র-জীবনের প্রতিক্রিয়ায় জীবনধর্মী মানুষের প্রকৃতিপ্রবণতাও আধুনিক শিল্পের এক স্বাভাবিক উপকরণ। তাই যখন দেখি যে, উন্মত্ত যৌবনের বিদ্রোহ ও মার্ক্স-ফ্রয়েডীয় উগ্র জীবনদর্শনের সংঘাতে খণ্ডিত আত্মার হাহাকার কল্লোল যুগের সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে আধুনিক যুগ-সচেতন বলে আখ্যা পেয়েছে, তখন তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভূতিভূষণের শান্ত, নির্জন প্রকৃতিচেতনা, যা আধুনিক মানুষকে সমস্ত গ্লানি, হতাশা, ও অবিশ্বাস থেকে রক্ষা করে জীবন ও আত্মার ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তাকে জীবন-বিমুখ, অলস আত্মরতি বলে সরিয়ে রাখব কোন্ যুক্তিতে? এই প্রকৃতিচেতনা নিশ্চয়ই জীবননিষ্ঠ, নিঃসংশয়ে যুগলক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। একে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে "শাশ্বত ভাবে আধুনিক

বিভূতিভূষণের শিল্পজগৎ প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রস-অনুভূতির আনন্দে বিহ্বল। তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, ডায়েরী, ভ্রমণ-কাহিনী—সর্বত্রই প্রকৃতির

লোকোত্তর সৌন্দর্য-স্পর্শ সহজেই অনুভব করা যায়। প্রকৃতির সঞ্জীবনী রস তাঁর সমস্ত সত্তায় এমনভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল যে জগৎ ও জীবনকে যখনই তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তখনই প্রকৃতিচেতনার নিগূঢ় রহস্যপথে তাঁকে পা বাড়াতে হয়েছে। প্রকৃতির বিশাল নীড়ের উষ্ণ মধুর আশ্রয়ে তাঁর শিল্প-সত্তা লালিত হয়েছে চিরকাল।

ব্যক্তি-জীবনেও দেখি, জন্ম থেকেই বিভূতিভূষণ প্রকৃতির সংস্পর্শে এসেছেন। পল্লী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, যশোহর জেলায় বারাকপুর গ্রামে, হুগলীর কাছে শাগঞ্জ-কেওটায় ও মামার বাড়ি মুরাতিপুরে কেটেছে তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি। নির্জন আকাশ, উধাও মাঠ আর নিঃসঙ্গ নদীতীরের গোপন সাহচর্যে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। কবিচেতনার সেই প্রথম উষা-লগ্ন। জীবনের সেই বিস্ময়কর মুহূর্তগুলিতে প্রকৃতি-সংস্পর্শ তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মনের ওপর যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে, তারই স্বীকৃতি আছে তাঁর অজস্র রচনায়। পৃথিবীকে তিনি প্রথম চিনলেন প্রকৃতির রহস্য-আলোয়। তাই প্রকৃতির মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত সহজ আর সজীব হতে পেরেছিল। জগতের সমস্ত দুঃখ, গ্লানি তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হত, যখনই তিনি মনে করতেন এ সব-কিছুকে ছাড়িয়ে জীবন মহৎ; কারণ আকাশ আর নক্ষত্রের আলো, অরণ্য আর পাহাড়ের রহস্য মহিমা এই জীবনকে ঘিরে আছে। প্রকৃতির বিরাট রূপের স্পর্শ শৈশব থেকেই তাঁর মনের মধ্যে গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, আর তারই প্রভাবে জীবন সম্পর্কেও তাঁর ধারণা এক বিচিত্র মহিমা লাভ করেছিল তাঁর নিজের কাছেই।

তাঁর এক গুণগ্রাহী সুহৃদ্ তাঁর বালক বয়সের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ছোটবেলা থেকেই তিনি মানুষের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গ অনেক বেশী ভালবাসতেন। ন' দশ বছর বয়সে বিভূতিভূষণ লোকালয় থেকে অনেক দূরে গিয়ে জনহীন স্থানে কিংবা নির্জন ইছামতীর তীরে দাঁড়িয়ে আপন মনে অবিরাম গল্প বলে যেতেন। একদিন, দুদিন নয়—দিনের পর দিন।

এই সামান্য ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সেই বালক বয়সেই কী নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। সে বন্ধন ছিল একান্ত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। বালক-বয়সের এই প্রকৃতিপ্রেম তাঁর সারা

জীবনের মধ্যেও এতটুকু শিথিল হয় নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যাযাবর পথিকের মত বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন—প্রকৃতির সেই সঞ্জীবনী অমৃত স্পর্শ নিরন্তর লাভ করবার জন্য। "হে অরণ্য কথা কও" "বনে-পাহাড়ে", "অভিযাত্রিক" "উর্মিমুখর" প্রভৃতি গ্রন্থে সেই যাযাবর জীবনের সানন্দ স্মৃতিগুলি অক্ষয় হয়ে আছে।

প্রকৃতির নিগূঢ় সত্তা সম্পর্কে বিভূতিভূষণের কবি ও দার্শনিক মনের বিস্ময়কর দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রাখে। কিন্তু তারও আগে একটা বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।—প্রকৃতির অন্তরশায়ী নিগূঢ় চেতনার কথা বলছি না, সে সম্পর্কে লেখকের আত্মমুখী (subjective) দৃষ্টিভঙ্গির কথাও নয়, আমরা বলছি প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের যে অনুপম রূপচিত্রটি কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের লেখায় ফুটে উঠেছে, তার কথা। প্রকৃতিচেতনার গোপন মহলে প্রবেশ করার আগে বাইরের রূপ আর ঐশ্বর্যের কিছুটা পরিচয় নিয়ে রাখি।

বিভূতিভূষণ অধিকাংশ প্রাচীন নিসর্গ-কবির মত প্রকৃতিকে জড়-সৌন্দর্য কিংবা মানব-জীবনের নিছক পটচিত্র হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তিনি তার অন্তর্লীন চেতন-সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই অর্থে তিনি ইংলণ্ডের উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিগোষ্ঠী কিংবা আমাদের সাহিত্যের বিহারীলাল অথবা রবীন্দ্রনাথের সহধর্মী। আধুনিক নিসর্গ-কাব্যধারার তিনি এক সার্থক উত্তরসূরী। তিনি মানুষের জীবন আর প্রকৃতিকে একসঙ্গে মিলিয়ে একেবারে পূর্ণ 'অদ্বৈতবাদী' হয়ে ওঠেন নি কোথাও, বরং প্রকৃতি আর মানুষ পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বের মর্যাদা পেয়েছে তাঁর 'দ্বৈতবাদী' দৃষ্টিতে।

প্রকৃতি সম্পর্কে এই ধরনের দৃষ্টি কিন্তু তাঁর একান্ত সহজাত। কোন কবি বা দার্শনিকের মতবাদ থেকে তাঁর এই ধারণা গড়ে ওঠেনি। বরং পশ্চিমীগোষ্ঠীর পূর্বতন কবি-শিল্পীদের অনেকেই প্রকৃতির সজীব সত্তা আবিষ্কার করে এমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে তাঁদের কাব্যে প্রকৃতির চেতনসত্তার সঙ্গে আপন হৃদয়ের যোগসূত্রের কথাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির নিজস্ব রূপ-সৌন্দর্যের চিত্র খুব বেশী একটা সেখানে চোখে পড়ে না।

কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রকৃতির অনন্যসাধারণ রূপের বর্ণনা একটা স্বতন্ত্র আসন লাভ করেছে। প্রকৃতি সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে তাঁর মন

কোন চিন্তা বা তত্ত্বের ভারে আচ্ছন্ন হয় নি। সেই বালকবয়সী রূপমুগ্ধ মন কেবল অভিভূত হয়েছিল বাঙলা দেশের আকাশ-মাটির প্রসারিত রূপের ঐশ্বর্যে। প্রকৃতির এই বাইরের রূপ রং থেকেই তাঁর মনে ধীরে ধীরে জেগেছে গভীরতর জিজ্ঞাসা, প্রকৃতির অন্তর্লোক সম্পর্কে সূক্ষ্মতর রহস্যবোধ। কিন্তু সকলের আগে উষা-লগ্নের সেই স্বপ্নমাখা আবছা আকাশ, অস্ফুট চেতনার মত অস্পষ্ট নদীতীর আর অরণ্য-মাটির রেখা! নিসর্গ-রূপের সেই উপলব্ধি উত্তরকালে লেখকের উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী আর দিনলিপির পাতায় পাতায় আশ্চর্য সোনার ফসল ফলিয়েছে। প্রকৃতির কান্ত-কোমল এবং রুক্ষ-কঠিন—দুই ধরনের রূপই তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। কান্ত-কোমল প্রকৃতির এই objective রূপের পরিচয় আছে 'পথের পাঁচালী' 'দৃষ্টি প্রদীপ', 'তৃণাঙ্কুর', 'ঊর্মিমুখর'-এর মধ্যে।

: সোনা ডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বন-ঝোপ, শিমুল, বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুরের কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় ঝুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রং-এর মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে-জোড়া উঁচু-নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা—বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে বাঁকিয়া চলিয়াছে। (পথের পাঁচালী)

এই বর্ণনার মধ্যে হয়ত ঐশ্বর্য নেই কিন্তু বাঙলা দেশের দিগন্তজোড়া মাঠের বর্ণনা এর চেয়ে আর কী বাস্তব হতে পারে? পল্লী বাঙলার এমন খণ্ড খণ্ড ছবি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নুড়ি পাথরের মত অজস্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নিছক প্রকৃতির রূপবর্ণনার দিক থেকে বাংলার বাইরে পাহাড় অরণ্যের ছবিতেই লেখক যেন বেশী মনোনিবেশ করেছেন। বিভূতিভূষণ পরিণত বয়সে ভ্রমণ ও কর্মোপলক্ষে বিহার এবং মধ্য প্রদেশের নিবিড় আরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে গিয়েছিলেন। তারই বিস্ময়কর বর্ণনা আছে নানা গ্রন্থে—'বনে পাহাড়ে', 'হে অরণ্য কথা কও', 'স্মৃতির রেখা' প্রভৃতি ডায়েরী ও ভ্রমণ-কথায়। তাছাড়া দুখানি উপন্যাসে—'অপরাজিত' ও 'আরণ্যকে'।

অরণ্য ও পর্বতের রুক্ষ কঠিন রূপ বিচিত্র অথচ আশ্চর্য শিল্পরেখায় ফুটে উঠেছে এই সব গ্রন্থে। বিশেষ করে 'আরণ্যক'এ। প্রকৃতির রূপের মধ্যে যে আদিম সৌন্দর্যের অত্যাশ্চর্য রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে, তা আরণ্যক-এর জগতে প্রবেশ করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা জানতাম না। কঠিন-বন্ধুর পর্বত আর জটিল-গহন অরণ্যের একদিকে বন্য ভয়াল সৌন্দর্য, অন্যদিকে তার স্বপ্নবিহ্বল আবেশ-জাগানো রহস্যময় রূপ—'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি-বর্ণনাকে সাহিত্যের ইতিহাসে এক দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

: রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোন দিকে আলো দেখা যায় না। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোন অজানা গ্রহলোকে নির্বাসিত হইয়াছি—দিগন্তরেখায় জ্বলজ্বলে বৃশ্চিক-রাশি উদিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক, নিম্নে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ নক্ষত্রলোকে পাতলা অন্ধকারে বন-ঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে—দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল – আরও দূরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে। (আরণ্যক)

প্রকৃতির রূপের এই যে objective বর্ণনা—এ প্রধানত: চিত্রধর্মী। রঙের পর রঙ ছড়িয়ে লেখক বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে যেন এই ছবিগুলি এঁকেছেন। কখনও তা হাল্কা জলরঙের ছবি, কখনও বা তেলরঙের বিরাট ল্যাণ্ডস্কেপ। লেখকের এই চিত্রধর্মী বর্ণনার মধ্যে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। লেখক একই সঙ্গে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের খুঁটিনাটি বিষয়ের যেমন বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি তার সমগ্র স্বরূপের ব্যঞ্জনাও ফুটিয়ে তুলেছেন। কালিদাস তথা প্রায় সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের প্রকৃতিবর্ণনায় এই খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেন। আর রোমান্টিক যুগের য়ুরোপীয় কবিদের কাব্যে ব্যঞ্জনাধর্মী বর্ণনার সাহায্যে প্রকৃতির সামগ্রিক ছবিটিকেই ফোটাবার প্রয়াস লক্ষণীয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যথেষ্ট আছে।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে' বিশেষভাবে, এই দুই রীতির প্রভাবই চোখে পড়ে। তিনি আরণ্য প্রকৃতির বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তার খুঁটিনাটি বাদ দেন নি। অরণ্যের প্রতিটি ফুল, পাখী, তৃণগুল্ম, নুড়িপাথর—কোন

কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। আবার এ সব-কিছুর বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও তাঁর 'আরণ্যক' ন্যাচারালিস্ট (Naturalist)-এর ডায়েরী হয়ে পড়ে নি। তার কারণ তিনি প্রকৃতিকে যেমন একেবারে কাছে থেকে দেখেছেন, তেমনি দূর থেকে তাকে সমগ্রভাবেও অনুভব করেছেন। প্রকৃতির এই সামগ্রিক চিত্ররূপ-ই তার প্রকৃত শিল্পরূপ। প্রকৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনা তাঁর রচনায় থাকা সত্ত্বেও, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চিত্র যে মহাকাব্যোচিত বিশাল ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য বহন করে, তার অন্যতম প্রধান কারণ, সেই বর্ণনার মধ্যেও নিহিত আছে মহৎ সংগীত-ধর্ম। নিসর্গ-চিত্রের খুঁটিনাটি বর্ণনায় যে ফাঁক থেকে যায়, সেগুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে সুরের ব্যঞ্জনায়। লেখকের সুরসমৃদ্ধ ভাষা নিছক বস্তুগত বর্ণনাগুলিকে এক অসামান্য রসলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়। কখনও বা এই সংগীত-ধর্ম মহাকাব্যের মত দূরপ্রসারী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ, কখনো বা বাউলের একতারার সুরের মত সহজ, স্বচ্ছ। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রথমোক্ত গীতিধর্ম এবং 'পথের পাঁচালী'তে দ্বিতীয় শ্রেণীর সুর-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

চিত্র ও সংগীত-ধর্মের এই আশ্চর্য সমন্বয়ের সাধনায় নিসর্গরূপশিল্পী বিভূতিভূষণ সিদ্ধকাম। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সফল উত্তরসাধক তিনি।

"এত পাখী, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব সৌন্দর্য এ সব যেন আমারই জন্যে সৃষ্টি হয়েছে।"

"এই প্রকৃতির সঙ্গে পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখদুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে…।"

"তৃণাংকুর" থেকে দুটি উদ্ধৃতি। নিসর্গরূপশিল্পী বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রেমের একটি গোপন কারণ এখানে বিবৃত হয়েছে। তাঁর হাতে প্রকৃতির রূপচিত্র যে এমন দুর্লভ সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তা কেবল লেখকের সূক্ষ্ম objective দৃষ্টিরই ফল নয়। সেই দৃষ্টির সঙ্গে মিশে আছে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমনের অপরিসীম বিস্ময়বোধ। প্রকৃতিকে

একদিকে যেমন তিনি প্রকৃতি রূপেই বর্ণনা করেছেন, তেমনি আবার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সেই প্রকৃতির মূল্য নিরূপণ করেছেন, তার সঙ্গে মানবসংযোগের নিবিড়তার মাপকাঠিতে। মানুষের দুঃখ আনন্দ কামনার স্পর্শে প্রকৃতি যেন আরও প্রাণময়ী, আরও রমণীয় হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণ সেকালের কবি নন, একালের জীবনরসিক কথাশিল্পী। তাই মানবরস-সম্পৃক্ত এক আত্মমুখী (subjective) দৃষ্টি তাঁর সমগ্র প্রকৃতি-বর্ণনায় সজাগ থেকেছে। কি 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীপ্রকৃতি চিত্রণে, কি 'আরণ্যকে'র ধূসর রিক্ত নাঢ়াবইহার আর মহালিখারূপের বর্ণনায়, সর্বত্রই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মানবহৃদয়ের ছায়াসম্পাত ঘটেছে। এই সংবেদনশীল হৃদয়—বিভিন্ন নামে,—বস্তুতঃ বিভূতিভূষণেরই কবিসত্তা। বিচিত্ররূপিণী এই প্রকৃতিকে লেখক কত বর্ষারাত্রির নির্জনতায়, ব্যাকুল বসন্ত দিনের কত চঞ্চল মুহূর্তে, কত সকাল সন্ধ্যা, সুখ দুঃখ আশা স্বপ্নের কত বিহ্বল অবকাশে অনুভব করেছেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গল্প-উপন্যাসে প্রকৃতির কত বিচিত্র বর্ণ সমারোহ, কত রূপশিল্প।

কিন্তু তাঁর এই প্রকৃতিচেতনার সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল যে সর্বত্রই তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন এক অপরিসীম বিস্ময়-দৃষ্টি নিয়ে। আর এই বিস্ময়বোধের মধ্যে যে স্বচ্ছ ঋজু সারল্য প্রকাশ পেয়েছে তা কেবল শিশুর মধ্যেই সম্ভব। জীবনের সেই প্রথম উষা-লগ্ন থেকে শেষদিন পর্যন্ত বিভূতিভূষণ অন্তশ্চেতনায় সত্যই অনন্তবিস্ময়-বিহ্বল এক অপাপবিদ্ধ দেবদুর্লভ শিশু রয়ে গিয়েছিলেন। জীবনে তিনি নানা বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন। মননশীল এক দার্শনিকের উপযুক্ত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু নির্জন অনুভূতির অন্তর্লোকে তিনি ছিলেন নিতান্তই স্বপ্নদর্শী এক শিশু। প্রকৃতি যে তাঁর কাছে কোনদিন জীর্ণ হয়ে যায় নি, প্রকৃতির রূপে রসে মুগ্ধ সেই প্রাণ যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বলে গিয়েছে—"এ আনন্দের তুলনা নেই" (উৎকর্ণ),—এই সহজ, অকৃত্রিম (unsophisticated) অকপট শিশু-দৃষ্টিই তার কারণ।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'তে এক শিশুকেই তিনি নায়ক করেছেন। এই শিশু নায়কের চোখ দিয়েই তিনি প্রকৃতির অন্তহীন বিস্ময়কে পাঠকমনে সঞ্চারিত করেছেন। তার কারণ লেখক জানতেন যে শৈশবের সহজ, স্বচ্ছ, অনাবিল দৃষ্টি, এক কথায় তার intuitive দৃষ্টির স্পর্শে যে সত্য

ও আনন্দের উৎসধারা উন্মুক্ত হয়, বয়োবৃদ্ধ এক প্রবীণ মানুষের বুদ্ধি-সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে সেই অসীম রহস্যলোক উদ্ঘাটিত হবার সম্ভাবনা কোথায় (তুলনীয় : ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'Ode on Immortality') ? শিশু-মনের মধ্যে কোথায় একটা আদিম ভাব আছে। নিরাবরণ, সংস্কারহীন সুস্থ অকৃত্রিম এক চেতনা। প্রকৃতির গাছপালা নদী, পাহাড়, প্রান্তরের মধ্যেও তেমনি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এক সহজ, সতেজ আদিম রূপের প্রকাশ। তাই প্রকৃতির নির্জন, নিস্তব্ধ প্রাণের গোপন অনুভূতিগুলি বয়স্ক বুদ্ধিজীবী মানুষ হয়ত কোনদিন গভীরভাবে বোঝে না, কিন্তু শিশুর স্বচ্ছ সংবেদনশীল মনে তা সহজেই তীব্র আবেগের সঞ্চার করে। 'পথের পাঁচালী' এই প্রকৃতি আর শিশুহৃদয়ের গোপন ভালবাসার নিবিড় অন্তরঙ্গ এক আলেখ্য। শিশুর মনের সঙ্গে প্রকৃতির একটি সহজ প্রেমের সংযোগ আছে, আর তাই, প্রকৃতির যা কিছু সামান্য উপকরণ, অতি তুচ্ছ ফুল-ফল-লতা-কীট-পতঙ্গ, সবই শিশুর চোখে অসামান্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে তাই দেখি আঁশশ্যাওড়া, ঘেঁটুফুল, মাকাললতা, টুনটুনি পাখীর মত নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর উপাদান দিয়েই শিশু অপু নিজের মনগড়া এক অপার্থিব রূপকথার জগৎ নির্মাণ করেছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর সকল উপন্যাসেই প্রকৃতিকে এই শিশুর দৃষ্টিপ্রদীপেই উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। সবসময় বয়সের বিচারে এই শৈশবকাল নির্ধারিত হয় না। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে অনেক সময়েই দেখা যায় যে তাঁর পরিণত-বয়স্ক নায়ক-নায়িকাও প্রকৃতিচেতনায় একান্তভাবে সহজ, আত্মভোলা এক শিশু-প্রাণ। 'পথের পাঁচালী'র অপু কিংবা 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র জিতু—প্রৌঢ় বয়সেও বস্তুতঃ সেই সরলপ্রাণ মুগ্ধমতি শিশুই রয়ে গেছে। জিতুর মধ্যে তবু কিছুটা পরিবর্তন হয়ত লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অপু জীবনের সর্ব অবস্থাতেই নিশ্চিন্দিপুরের সেই অসহায় গ্রাম্য বালকই রয়ে গেছে। দুচোখে তার প্রকৃতির অন্তহীন রহস্য আর সৌন্দর্য সম্পর্কে অপার বিস্ময়।

'আরণ্যক' উপন্যাসের সেই শিক্ষিত নাগরিক নায়ক—নেহাৎ অর্থের জন্য যাকে লবটুলিয়ার জনহীন অরণ্যে ম্যানেজারের পদ নিতে হয়েছিল—যার মন প্রকৃতির প্রতি কোনদিন আসক্ত ছিল না, কলকাতা শহরই ছিল যার কাছে একমাত্র সত্য—সেও যখন প্রকৃতির রূপমোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, তখন ধীরে

ধীরে তার চরিত্রের কঠিন বহিরাবরণ ভেদ করে একটি সহজ সংবেদনশীল শিশুপ্রাণ বিকশিত হয়ে উঠল।

অপু, দুর্গা, জিতু, 'আরণ্যকে'র নায়ক—সমস্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক যেন এই কথাই জানাতে চেয়েছেন যে প্রকৃতিকে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে পেতে হলে, তার অতল রহস্যভরা সৌন্দর্যকে গভীরভাবে জানতে হলে, মানুষকে শিশুর মত সহজ স্বচ্ছ নিরাবরণ এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হবে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে তাই প্রকৃতি আর শিশুহৃদয় একাকার হয়ে গেছে। আর একাধিক উপন্যাসের এই সমস্ত শিশুহৃদয়ের অন্তরালে আছে একটিমাত্র মন। সেটি স্বয়ং বিভূতিভূষণের। এই অর্থে তাঁর সমস্ত প্রকৃতিচেতনা মূলতঃ subjective বা আত্মমুখী। এ কথা যে আদৌ অসত্য নয়, তার প্রমাণ তাঁর ডায়েরী ও ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি। নিজের ডায়েরীর ('তৃণাংকুর' 'স্মৃতির রেখা' ইত্যাদি) নানা অংশ উত্তরকালে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যকে'র মধ্যে অবিকলরূপে স্থান পেয়েছে। [illegible]ৎ বিভূতিভূষণই অপু, অপুই আসলে বিভূতিভূষণ।

প্রকৃতিকে বিভূতিভূষণ শিশুমনের সহজ বিস্ময়দৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন। সমগ্র 'পথের পাঁচালী'তে বাংলার পল্লী-প্রকৃতির যে স্নিগ্ধ সরল রূপটি এক আশ্চর্য প্রসন্নতায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তার পেছনে আছে অপু তথা বিভূতিভূষণের অবাক দৃষ্টি। শিশুর এই দৃষ্টি যে কেবল বাংলার পল্লী প্রকৃতির স্নিগ্ধ সরল রূপকেই একান্ত আপনার করে নিয়েছে তাই নয়—'আরণ্যকে'র রুক্ষ বন্ধুর পার্বত্য ভূখণ্ড ও আরণ্য প্রকৃতিকেও যেন রূপকথার কোমল মধুর আলোয় স্নিগ্ধ সুন্দর করে তুলেছে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি যেন চিরকিশোর বিভূতিভূষণের কাছে খেলাঘর বিশেষ। তাই লবটুলিয়া, মহালিখারূপের ভীমকান্ত সৌন্দর্যও শেষ অবধি লেখকের subjective কিশোর দৃষ্টিতে সমস্ত ভয়াবহতা হারিয়ে এক অনুপম মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'সরস্বতী কুণ্ডী'র পাশে বসে লেখক বিচিত্র ফুল, পাখী, লতা ও জ্যোৎস্না রাতে বনদেবীদের যাওয়া-আসার কল্প-কাহিনী নিয়ে যে স্বপ্নজগৎ রচনা করেছেন, তার মধ্যে আরণ্য জীবনের ভয়াল রুদ্র রূপের চেয়ে কিশোর মনের মুগ্ধ বিস্ময়ই পরিস্ফুট হয়েছে মনে হয়। লেখক নিজেই বলেছেন: "সরস্বতী কুণ্ডী… সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে।"

'আরণ্যকে'র রুক্ষ-কঠিন ভূখণ্ডকে এমন স্বপ্নময় রূপ দিয়েছে লেখকের কিশোর মনের স্বপ্নবিহ্বল অন্তর্দৃষ্টি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও যেন বিস্মৃত না হই যে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার পিছনে কিশোর মনের সহজ স্নিগ্ধতা ও subjective দৃষ্টি যতই প্রাধান্য লাভ করুক না কেন, তিনি কখনই প্রকৃতির স্বরূপকে বিকৃত বা রূপান্তরিত করেননি। 'আরণ্যকে'র সৌন্দর্য-বর্ণনায় কিশোরের বিস্ময়-দৃষ্টি যতই প্রকাশ পেয়ে থাক, তার দ্বারা অরণ্য-প্রকৃতি বা জীবনের আদিম সৌন্দর্য ও অনির্বচনীয় রহস্য বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। অরণ্য পাহাড়ের বিস্ময়কর বর্ণনায়, মহিষের দেবতা টাঁড়বাড়ো ও কয়েকটি অতিপ্রাকৃত কাহিনীর বিবৃতিতে, গণু মাহাতো, রাজু, ধাতুরিয়া, ভানুমতী, মঞ্চী ইত্যাদি আরণ্য নরনারীর নিখুঁত চিত্রণে লেখকের কিশোর মনের অপরিসীম রোমান্টিক বিস্ময় ও সহজ বিশ্বাসবোধ 'আরণ্যকে'র গহন গম্ভীর রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তুলতে সাহায্য করেছে।

প্রকৃতিকে শিশুর সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছেন বিভূতিভূষণ। শিশুর কল্পনা উধাও, অবাধ। প্রকৃতিকে অনুভব করতে গিয়ে শিশু তার মনের উধাও গতি-প্রবণতাকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। প্রকৃতি তখন নিশ্চল স্থাবর পদার্থ থাকে না, জীবনের চঞ্চল ছন্দ বেজে ওঠে তার পায়ে। তখন পর্বত হতে চায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। শিশুর অবাধ কল্পনা ক্রমে বর্তমানকে অতিক্রম করে দুদিকে ডানা মেলে দেয়ঃ অতীত আর ভবিষ্যৎ। প্রকৃতির কোন একটি বিশেষ সৌন্দর্যবস্তুকে আশ্রয় করে একদিকে অতীত দিনের স্মৃতিরস সঞ্চিত হতে থাকে মনের গভীরে, অন্যদিকে অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নকল্পনা মনের আকাশে ভিড় করে আসে। এ শুধু দু' এক বছর আগের কোন ঘটনা বা অনুভূতির স্মৃতিমন্থন নয়, কিংবা মনের পাতায় আসন্ন ভবিষ্যতের ছবি আঁকা নয়—এ মহাকাল আর ইতিহাসের ঢেউ ভেঙে ভেঙে জন্ম-জন্মান্তরের পথ চলা।

বিভূতিভূষণ নিছক প্রকৃতির রূপকার নন। বিশ্বপ্রকৃতি আর মহাকালের

বিরাট চলমান রূপ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি যখনই প্রকৃতির কোন সৌন্দর্যবস্তুকে দেখেছেন তখনই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের বৃহৎ পটভূমিতে তার গভীরতর সৌন্দর্য ও রস তিনি উপলব্ধি করেছেন। 'অপরাজিত' গ্রন্থের শেষ অংশ থেকে দুটি উদ্ধৃতি হয়ত বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট করবে।

"একটা জায়গায় ঘনবনের মধ্যে সুঁড়িপথ, বড় গাছের পাতার ফাঁক দিয়া ঝলমলে পরিপূর্ণ রৌদ্র পড়িয়া কচি, সবুজ পাতার রাশি স্বচ্ছ দেখাইতেছে, কেমন একটা অপূর্ব সুগন্ধ উঠিতেছে বনঝোপ হইতে—সে (অপু) হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল সেদিকে চাহিয়াই। তার সেই অপূর্ব শৈশব জগৎটা।

"ঠিক এই রকম সুঁড়ি বনের পথ বাহিয়া এমনি রৌদ্রালোকিত ঘুঘু ডাকা দীর্ঘ শ্রাবণ দিনে, দুপুর ঘুরিয়া বৈকাল আসিবার পূর্ব সময়টিতে সে ও দিদি চৌশালিকের বাসা, পাকা মাকালফল, মিষ্টি রাংচিতার ফল খুঁজিয়া বেড়াইত—দুপুর রোদের গন্ধ মাখানো কত লতা দোলানো, সেই রহস্যভরা করুণ মধুর আনন্দলোকটি!"

"ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো বছর কাটিয়া যাইবে ··· । তখনও এইরকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিনহাজার বর্ষ পরের বৈশাখ দিনের শেষে। তখনও এই রকম পাখী ডাকিবে, এই রকম চাঁদ উঠিবে।···নিঃশব্দ শরৎ দুপুরে বনপথে ক্রীড়ারত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের বিচিত্র অনুভূতি-রাজির ইতিহাস [তখন] কোথায় লেখা থাকিবে? কোথায় লেখা থাকিবে বিস্মৃত অতীতে তার সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বিদেশ হইতে বহুদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া মায়ের হাতের বেলের সরবৎ খাওয়ার সেই মধুময় চৈত্র অপরাহ্নটি, বাঁশবনের ছায়ার অপরাহ্নের নিদ্রা ভাঙিয়া পাপিয়ার সে মন-মাতানো ডাক, কোথায় লেখা থাকিবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলির সে সব কাহিনী?"

'তৃণাংকুর', 'ঊর্মিমুখর', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' ইত্যাদি বহু গ্রন্থে বিভূতিভূষণের এই বিচিত্র রসনিবিড় প্রকৃতিচেতনার কথা আছে। কেবল প্রকৃতির বর্তমান রূপচিত্র নয়, তাকে আশ্রয় করে লেখকের রূপমুগ্ধ, বিস্ময়-বিহ্বল মন এক আশ্চর্য দৃষ্টি (vision) লাভ করেছে। সে দৃষ্টি শিশুমনের সহজ intuition মাত্র নয়; তা আসলে পরিণত মনের গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি। বিশ্ব

প্রকৃতির সীমাহীন নিবিড় সৌন্দর্যকে লেখক অনুভব করেছেন মহাকালের প্রেক্ষাপটে—যেখানে সৌন্দর্যবস্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ও স্মৃতিরূপে মনের গভীরে নিঃশব্দে রসসঞ্চার করে। শিশু মনের সরল বিস্ময়বোধ ও intuition -এর সঙ্গে পরিণত বয়সের দার্শনিক প্রজ্ঞাদৃষ্টি মিশে লেখকের মনে প্রকৃতির এই কালচেতনার স্বরূপটিকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। 'আরণ্যকে'র এক স্থানে লেখক মহালিখারূপ পাহাড়ের মহান গম্ভীর রূপ নিরীক্ষণ করতে করতে উপলব্ধি করেছেন :

"অতীত কোনদিনে···এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।"

প্রকৃতির বিবর্তমান রূপের এই যুগযুগান্তব্যাপী vision—বিভূতি-ভূষণের প্রকৃতিচেতনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির কোন কিছুই চিরস্থির স্থবির নয়, সমস্ত কিছুই চঞ্চল জঙ্গম জীবনাবর্তে ভেসে চলেছে। বৃহৎ বিশ্বলোকের অন্তর্ভুক্ত এই প্রকৃতির অন্তরালে এমন একটি অধ্যাত্ম সত্তা নিশ্চয়ই নিহিত আছে—যার ফলেই মহাকালের চলমান প্রেক্ষাপটে আমরা প্রকৃতির এই লোকলোকান্তরব্যাপী রূপটি প্রত্যক্ষ করি। নচেৎ প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যবস্তুই স্থাবর পদার্থরূপেই আমাদের মুগ্ধ করত। মানুষের মনে তার ওই চলমান বৃহৎ সজীব রূপ, তাকে আশ্রয় করে নিবিড় স্মৃতিরস ও অনাগত দিনের উদার স্বপ্ন তাহলে কখনই এমনভাবে সঞ্চারিত হত না। এ থেকেই বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনায় অধ্যাত্মবোধের সূচনা হয়েছে।

প্রকৃতির রূপ-চেতনা থেকে ধীরে ধীরে বিভূতিভূষণের মনে অরূপ চেতনার উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে তাঁর মন সন্ধান পেয়েছিল এক অতীন্দ্রিয় রস-দেবতার। সেই দেবতাকে তিনি অনুভব করেছিলেন আকাশ মাটি অরণ্যের অতি তুচ্ছ উপাদানের মধ্যে। তাঁর সাহিত্যে ও জীবনে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এই অধ্যাত্ম-চেতনার ক্রম অভিব্যক্তির স্পষ্ট পরিচয় আছে। "পথের পাঁচালী"তে নিশ্চিন্দিপুরের নির্জন প্রকৃতি শিশু-অপুর মনে যে দূরের আহ্বান জানিয়ে গেছে, যে রোমান্টিক রহস্য ও বিস্ময়ে তার মনকে দূরযানী স্বপ্নে চঞ্চল করে তুলেছে—সেই উপলব্ধি

ও চেতনাই উত্তরকালে 'অপরাজিত'-র অপুর মধ্যে পরিণত অধ্যাত্ম-জীবনবোধে রূপান্তরিত হয়েছে।

পথের পাঁচালীর শেষে দেখতে পাই কিশোর অপুর সামনে পথের দেবতা বিছিয়ে রেখেছেন অন্তহীন চলার আবেগ। কিশোর অপুকে ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন : "পথ তো আমার শেষ হয় নি, তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়। তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে……দেশ দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় এড়িয়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে।"—এই পথই অনন্ত জীবনের পথ। প্রকৃতির বিচিত্র রূপের ভিতর দিয়ে এই পথ চলে গেছে অধ্যাত্ম-জীবনের অরূপ জগতে। এই পথ দিয়েই অপুকে পেতে হয়েছিল 'অপরাজিত'-র অধ্যাত্ম উপলব্ধির সুগভীর পরিচয়। 'অপরাজিত'-র শেষে অপুর হৃদয় অনন্তজীবনের উপলব্ধি ও মহিমায় ভরে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্লোকের মর্মবাণী সে যেন শুনতে পেয়েছে : "সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীলশূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রব শোনায়।…তার মনে হইল……সে জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীলাকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষি মণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল আণ্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্ষদ পিতৃলোক—এই শত সহস্র শতাব্দী তার পায়ে চলার পথ—তার ও সকলের মৃত্যু দ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ বর্তমান।" বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছুই চঞ্চল, জঙ্গম জীবনের স্রোতে ভেসে চলেছে। তাই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে প্রকৃতির অন্তর্লীন অতীন্দ্রিয় সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে একমাত্র সেই মানুষ যে চিরপথিক। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তাঁরও

বাণী ছিল: চরৈবেতি। এই অন্তহীন চলার পথেই মহত্তর জীবন-চেতনা একদিন আত্মপ্রকাশ করবে, বিশ্বপ্রকৃতির cosmic রূপের পটভূমিতে।

প্রকৃতির ধ্যান কল্পনায় মগ্ন বিভূতিভূষণের হৃদয়ে বিশ্বদেবতার একটি মূর্তি-রূপ জেগে উঠেছিল। সে মূর্তি, সে দেবতা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি প্রকৃতির বিচিত্র রূপের অন্তরালবর্তী এক অখণ্ড চেতন শক্তি বিশেষ। হিন্দু ধর্মের প্রথাবদ্ধ পূজাপদ্ধতিতে তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। তিনি তাঁর দেবতাকে খুঁজে পেয়েছেন মুক্ত প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশ-মহিমার মধ্যে। "আজ ওবেলা যখন শালগ্রাম পূজা করছিলাম, তখনই আমার মনে হল এই ঘরের বদ্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভগবান নেই, তাঁকে আজ বিকেলে খুঁজব সুন্দরপুরের কিংবা নতিডাঙার বাঁওড়ের ধারে মাঠে, নীল আকাশের তলায়, অস্তবেলার পাখীদের কলকাকলীর মধ্যে।" ['তৃণাংকুর' ১১৯ পৃঃ]

বিভূতিভূষণের আরাধ্য দেবতা আসলে এক মহান শিল্পদেবতা—সমগ্র নিসর্গ-জগৎ যেন তাঁর ধ্যানকল্পনায় রচিত এক বিরাট মহাকাব্য। "হে অরণ্য কথা কও" গ্রন্থে লেখক সেই মহান দেবতার শিল্পীসত্তার বন্দনাগান করেছেন: "মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকামণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গ-কাকলীতে···অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু দলের যাতায়াতে··· তিনি আপনমনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেছেন।"

বিভূতিভূষণের এই অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বিস্ময়কর সংগতি আছে। বেদ কিংবা উপনিষদেও দেখেছি প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মহিমা উপলব্ধির ভিতর থেকেই ধীরে ধীরে নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধ ও দার্শনিক চেতনার জন্ম হয়েছে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্ররূপের মধ্যে এক অচঞ্চল সত্যে নিশ্চিত বিশ্বাস—ভারতীয় প্রকৃতিচেতনার এই পরম পরিণাম, এই মহৎ 'মিস্টিক' বোধ—"তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"—বলে প্রাচীন ঋষি যে-চেতনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ সেই বোধ ও চেতনার মহান উত্তরসাধক। তাঁরা দুজনেই রূপ ও ইন্দ্রিয়ের বিস্ময়-মুগ্ধ জগৎ থেকে ধীরে ধীরে অরূপ ও অতীন্দ্রিয় বোধের শান্ত গভীর

রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রকৃতিচেতনায় তাঁদের দুজনেরই ছিল রোমান্টিক ও মিস্টিক দৃষ্টির যুক্ত অধিকার। কথাটা অন্য দিক থেকে আর একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন।

পশ্চিমী সাহিত্যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বিশাল সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। নিসর্গ সৌন্দর্যের নিপুণ শিল্পী হিসেবে অনেক কবিই ওদেশে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। সুতরাং একথা সুনিশ্চিত যে তাঁদের প্রকৃতিচেতনার একটা বিশিষ্টতা আছে। পাশ্চাত্ত্য কবির সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় ঘটেছে রহস্য-অন্তরালের মাধ্যমে। তার মধ্যে আছে রোমান্টিক অস্পষ্টতা ও নিবিড়তর পরিচয়ের জন্য ব্যাকুলতা। প্রকৃতিকে পাশ্চাত্ত্য কবি রহস্যময়ী প্রিয়ারূপে কল্পনা করেছেন। তাকে নিয়ে স্বপ্ন আর রহস্যের আলোছায়া মেশানো মায়াজাল রচনা করেছেন। বায়রন শেলী কীটসের নিসর্গ-কাব্যের জগৎ এই রোমান্টিক রহস্য-ব্যাকুলতার জগৎ। প্রকৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কবির পরিচয় কখনও একান্তভাবে সহজ, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু প্রাচ্য কবির সঙ্গে প্রকৃতির জন্ম-জন্মান্তরের সহজ পরিচয়—তার মধ্যে যৌবনের প্রণয়-রহস্য নেই। সেখানে সন্তান-জননী, কিংবা ভাই-বোনের সহজ স্নেহমমতার সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাই-বোনের সম্পর্ক, এবং ইংরেজ ভাবুকের যেন স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক [পঞ্চভূত]।" সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির প্রসারিত রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাচ্য কবি অদ্বিতীয় এক মমতাময়ী বিশ্বজননীর সন্ধান পেয়ে, তার স্নেহমমতায় গভীর অখণ্ড বিশ্বাস স্থাপন করেছেন; পাশ্চাত্ত্য কবি কিন্তু চিরচঞ্চলা ছলনাময়ী প্রেয়সীর নিত্য পরিবর্তমান বিচিত্র রূপের মোহে বারবার বিভ্রান্ত হয়েছেন। প্রাচ্য কবির প্রকৃতি সম্পর্কে এই শান্ত সংযত দৃষ্টি, এই অচঞ্চল বিশ্বাস—তাঁদের প্রকৃতিচেতনাকে মিস্টিক করে তুলেছে। আর অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য কবিই প্রকৃতিচেতনায় মূলতঃ রোমান্টিক।

রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রেম মোটামুটিভাবে সমধর্মী। তাঁদের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দৃষ্টির বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনায় একদিকে যেমন রোমান্টিক 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', অন্যদিকে তেমনি 'সত্য সেই চিরন্তন এক'-এর নিশ্চিত প্রতীতি। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে, 'আরণ্যকে' রোমান্টিক বিস্ময় ও সহজ মিস্টিকধর্মী অধ্যাত্ম বিশ্বাস পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করেছে। 'আরণ্যক' গ্রন্থ

থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিলেই লেখকের এই রোমান্টিক ও মিস্টিক অনুভূতি সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে :

: জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয়, এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম। এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে।

: কতবার এই ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যার এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন. এই কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড় পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীল নীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে।

বিভূতিভূষণের মনের প্রকৃতি সম্পর্কে এই দ্বৈত চেতনার উদ্ভবের পিছনে তাঁর জীবন-পরিবেশ অনেকখানি সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করেছে। লেখকের শৈশব কেটেছে পল্লী-বাংলার জল হাওয়া আকাশের মধ্যে। 'পথের পাঁচালী'র অপু, দুর্গা তাঁরই শৈশব অনুভূতির শিল্প-প্রতিরূপ। তাই তাদের চোখে প্রকৃতি একান্ত সহজ। মায়ের সঙ্গে শিশুর যা সম্পর্ক, এখানে প্রকৃতির সঙ্গে অপু দুর্গার সম্বন্ধ তারই অনুরূপ। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের কোন রোমান্টিক ব্যবধান রচিত হয় নি। অপুর চোখে যে রোমান্সের বিস্ময় তা আসলে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এক দূর জীবনের স্বপ্ন। প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্পর্কে তার মনে একটি সজীব সতেজ বিস্ময়বোধ হয়ত আছে, সেই বোধ খাঁটি রোমান্টিক অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে—কেবলমাত্র দূর অজ্ঞাত জীবনের স্বপ্নকল্পনার সান্নিধ্যে এসে।

প্রকৃতি সম্পর্কে অপুর মনে রোমান্টিক রহস্যচেতনা জেগেছে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যলোকে। কলকাতার বদ্ধজীবনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতিকে নিয়ে বিস্ময়-মুগ্ধ স্বপ্নানুভূতির মধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে 'অপরাজিত' গ্রন্থের শেষে গিয়ে এই রোমান্টিক স্বপ্ন মিস্টিক চেতনার

স্থির আলোকে পরিণত হয়েছে। 'আরণ্যকে'র দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম দিকে মূলতঃ রোমান্টিক বিস্ময়ে ভরা। এর কারণ আছে। কারণ, এক নাগরিক মানুষের দৃষ্টি থেকে সেখানে অরণ্য-প্রকৃতিকে দেখবার প্রয়াস আছে। তাই প্রকৃতির যে কোন সামান্য উপকরণ সেই নাগরিক নায়কের কাছে এক বিস্ময়কর স্বপ্নলোকের স্পর্শ নিয়ে এসেছে। ক্রমশঃ সেই দৃষ্টির বিবর্তন হয়েছে। প্রথম দর্শনের রোমান্টিক বিস্ময়-বিহ্বলতা সরে গিয়ে সেখানে এসেছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও প্রত্যয়। নায়কের মন ক্রমশঃ প্রকৃতি সম্পর্কে এক শান্ত, স্থির মিস্টিক চেতনা ও সৌন্দর্যের গভীরতায় মগ্ন হয়েছে।

উনিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কবিতা যাঁরা লিখেছেন—তাঁদের মধ্যে শেলী কীটস টেনিসন ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি প্রধান। শেলীর কবিতায় প্রকৃতির অন্তর্লীন সৌন্দর্য-সত্তাকে জানবার জন্য কবিমনের তীব্র ব্যাকুলতার সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। কীটসের নিসর্গ-কবিতায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (sensuous) রসমধুর প্রকৃতি-চিত্রই অনবদ্য বর্ণসুষমা লাভ করেছে। আর টেনিসনের রোমান্টিক কবিতাগুলিতে প্রকৃতির যে চিত্র পাই, তা মনোরম সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকৃতি সেখানে পটভূমি মাত্র, মানুষই টেনিসনের কাব্যে প্রধান ভূমিকা পেয়েছে। অবশ্য প্রকৃতির অসামান্য সৌন্দর্যই সেখানে মানবীয় অনুভূতিগুলিতে প্রাণসঞ্চার করেছে।

রবীন্দ্রনাথ তথা বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রকৃতির এই সব কটি বৈশিষ্ট্যই অংশতঃ প্রকাশ পেয়েছে ; প্রকৃতির sensuous চিত্র, প্রকৃতির প্রাণসত্তাকে উপলব্ধির জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতা এবং মানুষ ও প্রকৃতির মিলিত অর্ধনারীশ্বর রূপকল্পনা বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনার প্রধান উপকরণ।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কবিদের মধ্যে বিভূতিভূষণের সর্বাধিক ভাবসাদৃশ্য আছে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সঙ্গে। বিভূতিভূষণের মত ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের শৈশবের দিনগুলিও কেটেছে পল্লীজীবনের শান্ত নিরালা পরিবেশে। 'ককার মাউথে'র নদী মাঠ অরণ্য ঝর্ণা—সেখানকার নির্জন দুপুর সোনালী বিকেল ধূসর সন্ধ্যা কিশোর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মনের মধ্যে প্রকৃতির রহস্য-চেতনাকে গভীর রেখায় অঙ্কিত করে দিয়েছিল। প্রকৃতির আপাত তুচ্ছ উপকরণ, যেমন কোকিলের ডাক জোনাকীর আলো প্রজাপতির পাখা—

এদেরই মধ্যে কবি অধ্যাত্ম জীবনের নিগূঢ় সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন। বিভূতিভূষণের পাঠক মাত্রেই জানেন, এ কথা তাঁর সম্পর্কেও কত গভীরভাবে সত্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার এখানেই প্রধান সাদৃশ্য যে তাঁরা কেউই প্রকৃতিকে মানবজীবনের সুখদুঃখের নিছক পটভূমি-রূপে গ্রহণ করেন নি, তাঁরা প্রকৃতিকে প্রাণময়ীরূপে কল্পনা করে তাকেই তাঁদের সাহিত্যের প্রধান ভূমিকা দিয়েছেন। প্রকৃতি তাঁদের কাছে নিছক অবসর মুহূর্তের বিলাস-সহচরী ছিল না, তাঁদের অধ্যাত্ম উপলব্ধির পথে সে সাধনসঙ্গিনী।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তথা প্রাচ্য কবিদের আর একটি প্রধান সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য কবির দৃষ্টি সাধারণভাবে রোমান্টিক। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিচেতনার মধ্যে প্রাচ্যকবি-সদৃশ মিস্টিক দৃষ্টির শান্ত-গভীর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। বিভূতিভূষণ রোমান্টিক চেতনার পথ পেরিয়ে যেমন বিশ্বব্যাপী এক অদ্বয় সত্যোপলব্ধিতে আশ্বস্ত হয়েছেন, রোমান্টিক যুগের কবিও তেমনি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সমগ্র বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে এক পরম ঐক্যের সন্ধান পেয়েছেন। 'Endless agitation'-এর মধ্যে মিস্টিক চেতনায় সমর্পিত-প্রাণ কবি 'Central peace'-এর সুগভীর সান্ত্বনা লাভ করেছেন—তাঁর মহৎ বিশ্বাসের দৃঢ়তায়।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাদৃশ্যের কথা সংক্ষেপে বললাম। তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায় সে বিষয়ে এবার সামান্য আলোচনা করা যাক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বিভূতিভূষণ দুজনেই প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্ম-শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। মানবজীবনের ওপর প্রকৃতির লোকোত্তর প্রভাবের কথাও দুজনেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতিচেতনায় এ ছাড়াও আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রকৃতির সাহায্যে মানুষের জীবনকে কি ভাবে সুন্দরতর করে গঠন করা যায়—সে বিষয়ে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁর কবিতার মধ্যেই মন্তব্য করেছেন। তাঁর প্রকৃতিচেতনায় মাঝে মাঝে শিল্পীকে আচ্ছন্ন করে এক নীতিবাদী শিক্ষক প্রধান হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের দৃষ্টি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন একান্তভাবে অধ্যাত্ম-প্রাণ মহৎ শিল্পীর দৃষ্টিতে। নীতি-শিক্ষা বা চরিত্র-গঠনের উদ্দেশ্য তাঁর কোনদিনই ছিল না।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে প্রকৃতির অন্তর্লীন সত্তার গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ যতখানি ঘটেছে, নিসর্গরূপের বর্ণনা সে অনুপাতে সামান্য। তাঁর কাব্যে নিসর্গ-বর্ণনার খুঁটিনাটি বিবরণ খুবই সামান্য। [: His nature was needlessly out of touch with the Naturalist's—Herford] কিন্তু বিভূতিভূষণের মধ্যে আমরা এই দুয়ের সার্থক সমন্বয় পেয়েছি। একদিকে প্রকৃতির রূপময়ী কান্তি, আর তারই অন্তরালে অন্যদিকে পেয়েছি নিগূঢ় প্রাণসত্তাকে।

এতক্ষণ যে সব পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনামূলক আলোচনা করলাম তাঁরা সকলেই কবি। ইংরেজী সাহিত্যে কথাশিল্পীদের মধ্যে হাডসন ও হার্ডির রচনায় প্রকৃতির একটি প্রধান ভূমিকা আছে। এঁরা দুজনেই মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় সংযোগ-সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। হাডসনের কথা বিভূতিভূষণ নিজের ডায়েরীতেই কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে তিনি হাডসনের অনুরাগী পাঠক ছিলেন এবং দু'জনের মধ্যে একটি ভাব-সংগতি ছিল। কিন্তু তবু হাডসনের রচনার প্রধান ত্রুটি—তিনি প্রধানতঃ Naturalist-এর দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেছেন। সব মিলিয়ে প্রকৃতির একটি সামগ্রিক সত্তার উপলব্ধি তিনি কোনদিন নিবিড় ভাবে করেন নি। তাঁর Green Mansions উপন্যাসে অরণ্যের একটি ভূমিকা আছে সত্য, কিন্তু অরণ্যকে উপলক্ষ করে আদিম জীবনের প্রেম, ঈর্ষা, হানাহানির চিত্রই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। অরণ্যের যে রহস্যময় গভীর প্রাণসত্তার পরিচয় বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে'র প্রধান ফলশ্রুতি, হাডসনের রচনায় তার ভগ্নাংশও মেলে না।

প্রকৃতি সম্পর্কে হার্ডির দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সুনির্দিষ্ট বলিষ্ঠ রূপ আছে। বিভূতিভূষণ ও হার্ডি দু'জনেই তাঁদের উপন্যাসে নরনারীর জীবন ও চরিত্রের ওপর প্রকৃতির বিস্ময়কর প্রভাবের কাহিনী বিবৃত করেছেন। তবে বিভূতিভূষণ যে প্রকৃতিকে স্নিগ্ধ, রোমান্টিক ও অতীন্দ্রিয় চেতনায় উজ্জ্বল করে চিত্রায়িত করেছেন—সেই প্রকৃতি হার্ডির চোখে মানবজীবনের অলংঘ্য অমোঘ নিয়তিরূপে ধরা দিয়েছে। হার্ডির কাছে জীবন ছিল দুঃখময়—তাঁর 'tragic apprehension of life'-(Abercrombie) এর পক্ষে প্রকৃতির নিরাসক্ত, নিষ্ঠুর পটভূমি (তুলনীয়: Egdon Heath) অনুকূল হয়েছে।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনাকে এই দিক দিয়ে বিচার করলে হার্ডির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলা চলে।

কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য কবি ও ঔপন্যাসিকের সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনার যে তুলনামূলক আলোচনা করলাম, তার কারণ এ নয় যে, বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর এঁদের কোন নির্দিষ্ট প্রভাব আছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা কোন দেশের কবি বা কথাশিল্পীর দ্বারা প্রভাবিত নয়। তিনি যে সহজাত দৃষ্টি ও মন নিয়ে জন্মেছিলেন—তারই স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম আবেগে তিনি আপন হৃদয়ের গভীরতম উপলব্ধিকে প্রকাশ করে গেছেন। তবুও যে এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন কবি ও কথাশিল্পীদের আলোচনা করলাম তার একমাত্র উদ্দেশ্য—অন্যান্য কবির নিসর্গানুভূতির পটভূমিতে বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য ও স্থান নির্ণয় করা।

আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের নিসর্গ-দৃষ্টির যে নিবিড় সাদৃশ্য চোখে পড়ে, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু এই আংশিক সাধর্ম্যের আড়ালে তাঁদের মূলগত দৃষ্টি ও মনোভঙ্গীর যে প্রভেদ চোখে পড়ে তা-ও নগণ্য নয়। প্রকৃতিচেতনায় বিভূতিভূষণ রোমান্টিক হ'লেও তাঁর দৃষ্টি চিরদিন একান্তভাবে 'unsophisticated'। একেবারে 'মাটির কাছাকাছি'। নিতান্তই সরল, নিরাভরণ।

কিন্তু বিদগ্ধ অভিজাত রবীন্দ্রনাথ নিসর্গচেতনায় যথেষ্ট 'urban'। অত্যন্ত সচেতন, পরিশীলিত, সুমার্জিত। তাঁর প্রকৃতিচিত্র দুর্মূল্য অলংকার-ঋদ্ধ। তাতে বিচিত্র-বর্ণ-বিন্যস্ত সূক্ষ্ম-কাজ-করা 'ইমেজ'-এর অজস্রতা। এদিক থেকে কালিদাসের নিসর্গ-শিল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সাদৃশ্য।

বিভূতিভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই নিসর্গলোকের রূপকল্পনার অন্তরে এক অতীন্দ্রিয় চেতনার দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌছেছিলেন। দু'জনের কাছেই সে প্রত্যয় এসেছে আপন সহজ বোধের সোপান পার হয়ে। দু'জনেরই রক্তের গভীরে পৌছেছিল সে বোধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সে বোধ গাঢ় হয়ে তত্ত্বের জমাটরূপ নিয়েছে মাঝে মাঝে। মননের সংস্পর্শে প্রকৃতির সহজ অনুভব রূপান্তরিত হয়েছে 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'বর্ষশেষ'-এর প্রগাঢ় প্রতীকী তত্ত্ব-উপলব্ধিতে।

কিন্তু বিভূতিভূষণের সরল শিশু-প্রাণ নায়কের চেতনায় প্রকৃতি কোথাও প্রতীকী তত্ত্ব হয়ে ওঠে নি। তা' সর্বত্রই পরম বিস্ময় আর নিবিড় ব্যাকুলতা।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক কথা বলা হল। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে যে-জগতের ছবি মেলে, সেখানে প্রকৃতির একটি প্রধান ভূমিকা। কিন্তু এহ বাহ্য বিভূতিভূষণের সাহিত্য ও জীবনদর্শনের পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে—তাঁকে কেবল প্রকৃতিচেতনার মধ্যে সংকীর্ণ সীমিত করে রাখলে চলবে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমার অন্বেষণ-উপলব্ধিই তাঁর মূল লক্ষ্য নয়। প্রকৃতি তাঁর কাছে কোনদিন 'End' নয়, যুগযুগান্তব্যাপী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-প্রসারী এই সৃষ্টির বিস্ময়কর অধ্যাত্ম-মহিমা-উপলব্ধির পথে প্রকৃতি একটি সোপান বা সংকেত মাত্র।

তাই পরিশেষে এই কথাটির ওপর জোর দিতে চাই যে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনাকে তাঁর জীবনদর্শনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে কিছুতেই দেখা সম্ভব নয়। প্রগাঢ় মানবপ্রেম, রহস্যময় কালচেতনা (Sense of Time) ও সূক্ষ্ম অধ্যাত্মপ্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তবে তাঁর প্রকৃতিচেতনার সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব।

॥ মানব চেতনা ও চরিত্র-চিত্রণ ॥

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নরনারীর চরিত্র পূর্ণ মর্যাদা ও স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে কিনা, এ নিয়ে সংশয়ের অন্ত নেই। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ, যাঁরা বিভূতিভূষণকে বাস্তববিমুখ স্বপ্নদর্শী লেখক বলে মনে করেন, তাঁরা বিভূতিভূষণের কল্পনা-শক্তির প্রসার ও নিগূঢ় প্রকৃতি-চেতনার প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হ'ন। তাঁর রচনাকে বাস্তব জীবনধর্মী উপন্যাসের মর্যাদা দিতে তাঁরা নারাজ। সুতরাং যে রচনা বাস্তবধর্মী উপন্যাসই হয়ে ওঠেনি, সেখানে সজীব নরনারীর বাস্তব জীবনচিত্র প্রত্যাশা করা চলেনা। যে সব নরনারীর কথা সেখানে বর্ণিত হয়েছে, তাদের বেশীর ভাগই লেখকের নিজস্ব অধ্যাত্ম প্রেরণা ও প্রকৃতি-চেতনার চাপে আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক ধরণের রক্তমাংসহীন, অবাস্তব জগতের প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাপীড়িত, সহজ সুখ-দুঃখে জড়ানো, দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ মানুষের প্রতিরূপ হিসেবে তাদের কখনোই গ্রহণ করা চলেনা।

এ গেল চরমপন্থীদের কথা। আরেক শ্রেণীর পাঠক আছেন, যাঁরা বিভূতিভূষণের মানবপ্রীতি ও মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গীকে একেবারে অস্বীকার করেন না। বিভূতিভূষণ স্বপ্নদর্শী অধ্যাত্মপ্রবণ এক উদাসীন প্রকৃতির শিল্পী, একথা তাঁরা বলেন বটে, কিন্তু আবার এ-ও বলেন যে, তিনি মানব-বিরোধী শিল্পী ছিলেন না। প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপলোকে তিনি স্বপ্নমুগ্ধ জীবন কাটিয়েছেন হয়তো অনেক সময়, তবু তারি মধ্যে নরনারীর জীবনের সহজসুন্দর ছবি তিনি এঁকে গেছেন, মানুষের প্রতি সহজ ভালোবাসা তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভিতর থেকে পুষ্প-সৌরভের মতো উৎসারিত হয়েছে অবারিত আনন্দে। চাইল্ড হ্যারল্ডের মতো বিভূতিভূষণের মনের কথাটিও যেন এই:
I love not Man the less, but Nature more.

প্রকৃতির মতো অতোখানি না হ'ক, তবু-ও তো মানুষের প্রতি মমত্ব-বোধের অভাব ছিলনা বিভূতিভূষণের। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকগোষ্ঠীর মনোভাব অনেকটা এই রকমের।

কিন্তু উপরের দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর কোনটিকেই যথার্থ ব'লে গ্রহণ করা চলে না। চরম বা নরম, উভয়পন্থী পাঠকেরই মতে বিভূতিভূষণের রচনায় মানুষ গৌণ, মুখ্যস্থান পেয়েছে প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম-চেতনা। 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্যপ্রকৃতির স্বপ্নমোহ, তার অনির্বচনীয়, রহস্য-নিবিড় সৌন্দর্য-চিত্রই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে অরণ্যচারী আদিম মানুষের জীবন-বর্ণনা যেন অনেকখানি অপ্রধান আর নিষ্প্রভ। মনে হয় যেন প্রকৃতি-পরিবেশকেই পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলবার জন্য লেখক সেখানে নরনারীর চরিত্র এনেছেন—চরিত্রগুলি আপনা থেকে কাহিনীর স্বাভাবিক কার্য্য-কারণ সূত্রে এসে উপস্থিত হয়নি। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের নায়ক জিতু-কে লেখক বাস্তব ও জীবন্ত মানুষ হিসেবে যতখানি না অনুভব করেছেন, অধ্যাত্ম-চেতনা-বিকাশের একটি দৃষ্টান্ত বা প্রতীক হিসেবে তার চাইতে বেশী গ্রহণ করেছেন। সে যেন বাংলাদেশের সহজ মানুষ নয়—লেখকের ভাবলোকই যেন তার প্রকৃত সঞ্চরণ-ভূমি। লেখকের মন যেন নায়ক চরিত্রের বাস্তবতা-অবাস্তবতা নিয়ে আদৌ তেমন মাথা ঘামায় না, তার গূঢ় অভিপ্রায়, অধ্যাত্ম-প্রেরণায় উজ্জ্বল একটি জীবন-পরিবেশ রচনা করা।

এ ত' গেল প্রতিপক্ষদলের মত। কিন্তু কথাটার যৌক্তিকতা কতখানি সে সম্পর্কে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম চেতনার পটভূমি উপন্যাসের মধ্যে থাকলেই কোন রচনা জীবন-সচেতনতা হারায় না, কিংবা সেই লেখককে মানুষ সম্পর্কে উদাসীন, নিস্পৃহ ব'লে রায় দেওয়া চলে না। তাহ'লে ওদেশের জীবনবাদী সাহিত্যরথীদের তালিকা থেকে বোয়ার, রলঁ্যা, হার্ডি প্রমুখ লেখকদের নাম কাটা যেত। প্রতিপক্ষদল হয়ত বলবেন, ঠিক তা নয়। সাহিত্যে প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম অনুভূতি থাকাটা কিছু দোষের নয়। আসল বক্তব্য এই যে, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে মানুষের চেয়ে প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম চেতনাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষকে অবহেলা করে এই অতিরিক্ত প্রকৃতি ও অধ্যাত্মবোধ-প্রবণতাই জীবনধর্মী ঔপন্যাসিকের পক্ষে অমার্জনীয় ত্রুটি।

কিন্তু সত্যই কি বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে মানুষকে উপেক্ষা ক'রে কেবল নিসর্গের অনির্বচনীয় রূপ আর তারই অন্তরশায়ী রূপাতীত অতীন্দ্রিয় চেতনায় তন্ময় থেকেছেন? তাঁর উপন্যাসে মানুষ কি প্রক্ষিপ্ত বা অবান্তর প্রসংগ মাত্র?

যুক্তিনিষ্ঠ ও শান্ত বিচারশীল মন একথাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারে না। বরং বিপরীত যুক্তি দেখিয়ে একথাই বলতে পারে যে, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যুদ্ধোত্তর অনিশ্চিত সামাজিক পরিবেশ যখন দ্বন্দ্ব, সংশয় ও অবক্ষয়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, মানুষের জীবনের কোন সুনির্দিষ্ট মূল্য ও মর্যাদা যখন সমসাময়িক শিল্পীমানসে উদ্ভাসিত হচ্ছে না, তখন বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাস ও গল্পের মাধ্যমে মানবমহিমার নূতন ও মহৎ মূল্যবোধের প্রেরণায় মানুষের মনকে আশ্বস্ত করলেন। হতাশা-পীড়িত বিভ্রান্ত মানুষকে জীবন ও মনুষ্যত্ব সম্পর্কে মহৎ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করলেন। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'-র নায়ক—জীবনের বিচিত্র দুঃখ-বেদনা, হতাশা ও কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত 'অপরাজিত' থেকে গেছে। জীবনের সমস্ত কুশ্রীতা ও হীনতার উর্ধ্বে আপন আদর্শ, বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে জয়যুক্ত করেছে। এই একটিমাত্র দৃষ্টান্ত থেকেই একথা সূর্যালোকের মত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, মানুষ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও মমত্ববোধ কতখানি গভীর আর আন্তরিক ছিল। 'অমৃতের সন্তান' মানুষ। সমস্ত দুঃখ-বেদনা-পীড়নকে অস্বীকার ক'রে নয়, তাকে জয় ক'রে, অতিক্রম ক'রে, মানুষের অপরিসীম প্রাণশক্তির যে অপরাজিত মহিমা, তাকেই 'পথের-পাঁচালী'-'অপরাজিত' কিংবা 'দৃষ্টিপ্রদীপ' গ্রন্থের সত্যকার মর্মবাণী বলে যদি গ্রহণ করি, নিশ্চয়ই তা' গ্রন্থগুলির বিকৃত ভাষ্য হ'বে না। তা যদি না হয়, তবে একথা অনস্বীকার্য যে মহাকালের চলমান-রূপ বা প্রকৃতির মহৎ প্রেক্ষাপট—ওই উপন্যাসগুলিতে লেখকের মানবচেতনাকেই পরিস্ফুট ও পরিশুদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করেছে, তাঁকে মানববিমুখ ক'রে তোলেনি।

'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে দেখতে পাই, এক লোকোত্তর অধ্যাত্মজীবনের আকর্ষণ নায়ককে তার প্রথম জীবনে ঘরছাড়া করেছে। কিন্তু জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অজস্র ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক সংগ্রামের অন্তহীন পথ পার হয়ে এসে শেষ পর্যন্ত সে অনুভব করল, তার দেবতার পথ "ওই পিঙ্গল ও পাটলবর্ণের মেঘপর্বতের ওপারে কোন অজানা নক্ষত্রপুরীর দিকে নয়, তাঁর পথ—আমি (কাহিনীর নায়ক) যেখান দিয়ে হাঁটছি, ওই কালু গাড়োয়ান যে পথ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ পথেও।"

এই পথই—মানব সংসারের প্রতিদিনের পথ। সহজ, মানবীয় জীবন-পিপাসার পথ। তাই শেষ পর্যন্ত নায়ক সহজ সাধারণ একটি গ্রাম্যমেয়ের প্রেমকে মর্যাদা দিল, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধল। দাদার সংসারের দুঃখ ও দারিদ্র্যকে বুক পেতে নিয়ে, জীবনের ছোট-খাটো দুঃখ-সুখের অবকাশে জীবনকে উপলব্ধি করতে চাইল।

বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনার মধ্যেই স্পষ্ট ভাষায় কিংবা ব্যঞ্জনায় এই গভীর উদার মানবপ্রীতির প্রকাশ আছে। কিন্তু এ' প্রশ্ন নিয়ে এত জটিল প্রসংগ অবতারণার প্রয়োজনই-বা কিসের? সার্থক শিল্পসৃষ্টি ও মানবপ্রীতির অভাব—এ ত' একেবারে স্ববিরোধী চিন্তা। কারণ মানবপ্রেমই ত' জীবনরসের প্রকৃত উৎস। অথচ সকলেই জানেন, সৃষ্টির মূলে জীবনরসবোধ না থাকলে, কখনই রসোত্তীর্ণ শিল্প রচিত হয় না। (জীবনের প্রতি মানুষের সুগভীর ভালবাসার উপলব্ধিই শিল্পের মধ্যে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি বৈরাগ্য কখনই সত্যকার শিল্পীর ধর্ম নয়। সুতরাং বিভূতিভূষণকে যদি সার্থক শিল্পস্রষ্টা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে তাঁর মানবপ্রীতি ও জীবনবোধ নিয়ে আর কোন সংশয় বা তর্কের অবকাশ থাকতে পারে না।)

আগেই বলেছি, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতির বিচিত্র-সুন্দর রূপ বা অধ্যাত্মজীবনের উপলব্ধি আসলে মানবমহিমাকেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করার জন্য। মানুষকে অবহেলা ক'রে কেবল প্রকৃতি বা ঈশ্বরের স্বরূপ-মহিমা উদ্‌ঘাটিত করার জন্য বিভূতিভূষণ লেখনী ধরেন নি।

'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্য-পর্বতের রহস্যনিবিড় যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, সেকথা মনে রেখেও একটি প্রশ্ন করব। 'আরণ্যক' পড়ার পর পাঠকের মনে কি কেবলই লবটুলিয়া বইহার বা আজমাবাদের অরণ্য-পর্বতের স্মৃতিই উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকে? সেই সঙ্গে কুন্তা, মঞ্চী, ভানুমতী, মটুকনাথ, নাটুয়া-বালক ধাতুরিয়া, গনুমাহাতো, এদের করুণ-মধুর জীবন-চিত্রও কি পাঠকের মনে গভীর সংবেদনা জাগায় না? 'আরণ্যক' গ্রন্থের

'নায়ক' যখন বহুকাল পরে অতীত দিনের সেই অরণ্য-পথের স্মৃতিমন্থন করছে, তখন অরণ্য-চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র নরনারীর স্মৃতি তার মনকে উদাস ও বিহ্বল ক'রে তুলেছে।

: শুধু বন প্রান্তর নয়, কত ধরণের মানুষ দেখিয়াছিলাম।.........কত অতিদরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল।

: মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত অরণ্যভূমিতে কী করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরিধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে!......কত কাল তাহাদের আর খবর রাখি না।"

'আরণ্যক' উপন্যাসের সমাপ্তি এই সুরে। এই সুগভীর মানবপ্রীতির নিবিড় রসানুভূতিতে। এবং সমস্ত 'আরণ্যক' গ্রন্থের ফলশ্রুতি, এই আদিম অথচ করুণ-মধুর মানব-জীবনের সঙ্গে বিশাল প্রকৃতির অচ্ছেদ্য ঐক্যবন্ধনের ব্যঞ্জনা। বিভূতিভূষণের মানব-চেতনা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পরিণত ছিল বলেই তিনি 'আরণ্যক' গ্রন্থে আধুনিক নাগর-সভ্যতার অশান্ত, বিক্ষুব্ধ মানুষকে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন, প্রকৃতির সুস্থ সতেজ ও মুক্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারলেই মানুষের জীবনে শান্তি আসবে। বর্তমান সভ্যতার এই কৃত্রিম পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রাণের অন্তরঙ্গ যোগ কিছুতেই হ'তে পারে না। মানুষ প্রকৃতির আদিম সন্তান। সেখানেই তার প্রাণের সহজ স্ফূর্তি, মনের অনায়াস প্রশান্তি। সুতরাং 'আরণ্যক' নিছক প্রকৃতির সৌন্দর্য-বিলাসের মনোরম লিপিচিত্র নয়, তার মধ্যে বিভূতিভূষণের একটি বলিষ্ঠ ও বাস্তব মানবচেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

আধুনিক কথাসাহিত্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড় সমস্যাকে আশ্রয় ক'রে যে সমাজ-সচেতন বা মনঃসমীক্ষামূলক গল্প উপন্যাস রচিত হচ্ছে; কেবলমাত্র তারই নিরিখে বিচার করলে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে মানব-চেতনা সম্পর্কে দ্বিধা-সংশয় উপস্থিত হতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে মনে হবে, বিভূতিভূষণ মানুষকে একেবারে অস্বীকার না করলেও তার জীবনের বাস্তব সমস্যা বা ছবিকে নিকট থেকে দেখার চেষ্টা করেন নি। মানুষকে তার প্রতিদিনের সমস্যাকীর্ণ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার মধ্যে লেখকের

যে সমবেদনা ও মমতার অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পায়, বিভূতিভূষণের রচনায় তা' প্রায় অনুপস্থিত।

কথাটা ঠিক নয়। বিভূতিভূষণের উপন্যাস ও ছোট গল্প যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েছেন, তাঁরা জানেন, তিনি বাংলাদেশের দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের গৃহজীবনের সুখ-দুঃখ দারিদ্র্য-বিড়ম্বনার ছবি কী গভীর আন্তরিকতা নিয়ে এঁকে গেছেন। হয়ত' এমন হ'তে পারে যে সেসব রচনার মধ্যে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে লেখকের কোন বিশিষ্ট বক্তব্য নেই। কোন নির্দিষ্ট সমাধানের দিকে তিনি অঙ্গুলি সংকেত করেন নি। কিন্তু উপন্যাস বা গল্পের মধ্যে সমাজ সম্পর্কে কোন বক্তব্য বা সমাধান প্রকাশ করা যে সাহিত্যিকের প্রধান কর্তব্য নয়, একথা বোধ হয় সবাই বিশ্বাস করেন। শিল্পী বা সাহিত্যিকের প্রধান কাজ, জীবনকে প্রকাশ করা, তার যথাযথরূপের ছবি এঁকে যাওয়া। সুতরাং বিভূতিভূষণের রচনায় মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনার সেই ছবি যখন পাওয়া যায়, তখন সে সাহিত্যে মানবজীবনের বাস্তব পরিচয় নেই, একথা বলা কি আদৌ সঙ্গত হবে?

তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। সাধারণ গল্প-উপন্যাসে যে-পরিমাণ যুগ-সচেতনতা প্রকাশ পায়, কোন বিশেষ যুগের মানুষের জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি মেলে, বিভূতিভূষণের সাহিত্য ঠিক সেই শ্রেণীর রচনা নয়। তাঁর কাহিনীর মধ্যে যে যুগের আভাস বা পরিচয় পাই, তাকে বর্তমান বলে অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া চলে, কিন্তু সে কেবলই বর্তমান নয়। বর্তমান যুগের কথা হয়েও সে যেন বর্তমানকে অতিক্রম ক'রে মানুষের নিত্যকালের কাহিনী হয়ে উঠেছে। সমকালীন অন্যান্য অধিকাংশ লেখকের কাহিনীকে যখন বিশেষ একটি যুগের গল্প বলে মনে হয়, শাশ্বত জীবনের সাধক বিভূতিভূষণের আদর্শবাদী কল্পনায় সে কাহিনী অনন্ত অখণ্ড এক মানবচেতনার রসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের এই সামগ্রিক মানবচেতনা ও জীবন-কল্পনাই তাঁর সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। জীবনের ছোট-খাটো ঘটনা, আপাত-তুচ্ছ সৌন্দর্যের ভিতর থেকে লেখক আনন্দময় এক অনন্ত জীবনের আশ্বাস পান। এ যেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের "joy in the widest commonalty spread" কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত "ধূলির আসনে বসি" ধ্যান-দৃষ্টিতে ভূমার উপলব্ধি।

"পথের পাঁচালী" "অপরাজিত" কিংবা "দৃষ্টি প্রদীপে" এই ভাবে জীবনের অতিতুচ্ছ ঘটনার অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে অপু ও জিতুর মনে জীবন সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ও মহিমাবোধ জাগ্রত হয়েছে। মানুষের জীবনের এই যে "Becoming"-এর তত্ত্ব, এর চেয়ে গভীরতর সত্য আর কী হতে পারে? বেকার সমস্যা বা দেহকামনার তীব্র পীড়নের বর্ণনা দিলেই কি মানুষ সম্পর্কে এর চেয়ে নিবিড়তর বোধের পরিচয় দেওয়া হ'বে?

'অপরাজিত'-র একেবারে শেষে অপুর মনের যে উপলব্ধি, তার সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি। এ থেকেই মানুষ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের সত্যকার অকৃত্রিম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

ঃ......তার মনে হইল সে দীন নয়, তুচ্ছ নয়—এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভ-ও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন্ সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তা'র গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল আণ্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্ষদ পিতৃলোক—এই শত সহস্র শতাব্দী তার পায়ে-চলার পথ।

শত দুঃখ-বেদনা ও তুচ্ছতার মধ্যেও অন্তহীন মহাকাল ও অসীম বিশ্বলোকের পটভূমিতে মানুষের অপরাজিত পথিক-সত্তার রূপকল্পনায় বিভূতিভূষণ নিপীড়িত সংশয়ক্লিষ্ট মানুষকে যে অমৃতময় আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন, জীবন সম্পর্কে সেই বলিষ্ঠ সুরই তাঁর সাহিত্যের প্রকৃত ফলশ্রুতি।

এতক্ষণ ধরে বিভূতিভূষণের মানবচেতনা সম্পর্কে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করা হ'ল, তা' লেখকের অখণ্ড বা সমগ্র মানবচেতনা। বিভূতিভূষণের রচনায় মানুষ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে, তারই ওপর নির্ভর ক'রে আমরা এই আলোচনা করেছি। মানুষের জীবন ও চরিত্র নিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু রচনা করেন। সেই কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখকের রচনার উদ্দেশ্য বা আদর্শ ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। ক্রমশঃ মানুষ সম্পর্কে তাঁর বিচিত্র-ধারণা ও উপলব্ধির পরিচয় মেলে। কেবলমাত্র একটি অখণ্ড

মানবচেতনা ও মানবপ্রীতির তত্ত্বই ঔপন্যাসিককে মহৎ শিল্পীর মর্যাদা দেয় না। সেই চেতনাকে ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনীর মধ্যে পরিস্ফুট ক'রে তোলেন বিশ্লেষণ-বিন্যাসের দ্বারা। বিচিত্র মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখের অজস্র খণ্ড রূপের ভিতর দিয়ে লেখক মানবজীবনের বৃহৎ ও সমগ্র রূপের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। এই হ'ল ঔপন্যাসিকের শিল্প-কৌশল। তাঁর বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির আসল তাৎপর্য।

ঔপন্যাসিকের এই চরিত্র সৃষ্টির কোন বাঁধা পথ নেই। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন পথ। দেশ কাল ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। ডিকেন্সের চরিত্র-সৃজনপদ্ধতির সঙ্গে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বা হাক্সলীর রীতির সাদৃশ্য নেই। টলস্টয় আর শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য তাঁদের চরিত্র-চিত্রণ-রীতিতেও বিরাট প্রভেদ এনে দিয়েছে। একই যুগের, একই দেশের লেখক হওয়া সত্ত্বেও কল্লোলপন্থীদের সঙ্গে বিভূতিভূষণের চরিত্র-চিত্রণ-পদ্ধতির সাদৃশ্য চোখে পড়ে না। বরং গরমিলটাই বেশী মনে হয়।

আধুনিক উপন্যাসে সাধারণতঃ নরনারীর চরিত্র গঠন করতে গিয়ে লেখক তাদের জটিল মনস্তত্ত্ব, নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমাজ ও ব্যক্তিমনের কঠিন সংঘাতকেই প্রধান করে তোলেন। নানা বিপরীত বৃত্তি ও ঘটনার আবর্তে নায়ক-নায়িকার জীবন যখন বিপর্যস্ত হয়, তখনই চরিত্রগুলির বাস্তবস্বরূপ ফুটে ওঠে। কারণ সজীব বাস্তব চরিত্রের লক্ষণই হ'ল ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিবর্তন বা পরিণতি লাভ করা। কোন চরিত্র কাহিনীর সুরুতেও ঠিক যে-রূপে প্রকাশিত, কাহিনীর শেষে-ও যদি তার অবিকল সেই রূপই থাকে, কোন বৈচিত্র্য, দ্বন্দ্ব বা পরিণতি তার মধ্যে সূচিত বা পরিস্ফুট না হয়, তাহলে তাকে কখনই বাস্তবধর্মী চরিত্র বলা যেতে পারে না। বাস্তব জগতে আমরা কখনই এমন চরিত্রের সাক্ষাৎ পাইনে, যার জীবনে দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ বা পরিণতি নেই। সুতরাং সেই জাতীয় চরিত্র হয় 'টাইপ', (ই. এম. ফরস্টার যাকে flat বা static চরিত্র বলেছেন), নয়তো নিছক 'রোম্যান্টিক' বলে গণ্য হবে।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে আমরা বিচিত্র ধরণের নরনারীর দেখা পাই। ধনী জমিদার ও শহরের বিত্তবান্ সম্ভ্রান্ত মানুষ থেকে সুরু করে অধ্যাত্ম-প্রবণ স্বপ্নদর্শী কিশোর ও তরুণ, গরীব কথক ঠাকুর, সামান্য স্কুলশিক্ষক, মফঃস্বল

হোটেলের সামান্য পাচক ও ঝি, গাঁয়ের ডাক্তার, দুশ্চরিত্র শয়তান, বাঈজী, অরণ্যবাসী আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী—বিভিন্ন স্তরের মানুষ লেখকের সংবেদনশীল কল্পনায় ধরা দিয়েছে। কিন্তু এই বিচিত্র নরনারীর চরিত্র অন্য যে কোন ঔপন্যাসিকের হাতে রঙে, রেখায় যে রূপ লাভ করতো, বিভূতিভূষণ তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণে তাদের চিত্রিত করেছেন। যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে ওই চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠা 'স্বাভাবিক' ছিল, বিভূতিভূষণের রচনায় সেই 'স্বাভাবিক' ঘটনাটুকু চোখে পড়ে না। দ্বন্দ্ব সংঘাতকে বাস্তব চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ধরলে, বিভূতিভূষণের সৃষ্ট অধিকাংশ নরনারীকে ঠিক যেন পরিপূর্ণ চরিত্র বলা চলে না। একথা অনস্বীকার্য। তারা যেন লেখকের এক একটি স্মৃতি-মন্থন-করা impression। তাদের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ জীবন-সংগ্রামের চেয়ে সহজ সরল জীবন পিপাসাই যেন অনেক বেশী পরিস্ফুট। বেশীর ভাগ চরিত্রই যেন একরঙা ছবির মতই সহজ, অনাড়ম্বর। কিন্তু তাই বলে তাদের জীবন 'চিত্রার্পিতবৎ' স্থির বা জড় নয়। সমগ্র কাহিনীর শেষে এই ছবিগুলি পাঠক মনে একটি সুরময় অনুভূতির গভীর ছাপ রেখে যায়। তা একান্ত বাস্তব অথচ চিরন্তন রসবস্তু।

বিভূতিভূষণের এই চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অপেক্ষাকৃত অভাব থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে চরিত্রগুলি কখনই নিতান্ত 'টাইপ' বা কল্পলোকের রোম্যাণ্টিক জীব হয়ে উঠেনি। যদু-মাষ্টার, হাজারী ঠাকুর, যুগলপ্রসাদ, হরিহর, সর্বজয়া, এদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব বেশী থাক বা না থাক, এরা সহৃদয় পাঠকের অন্তর্লোকে কখনই অবাস্তব বলে অবহেলিত হবে না। এরা খাঁটি রক্তমাংসের মানুষ। এদের চরিত্র সজীব বাস্তব মানুষেই চরিত্র।

এখন প্রশ্ন হ'ল, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে গল্পে এ'ধরণের চরিত্র-সৃষ্টির কারণই বা কী? মাটির পৃথিবীর রক্তমাংসের চরিত্র হয়েও কেন এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রবল হ'ল না? কেন এই চরিত্রগুলিকে ঘিরে এক সহজ সুরময় অনুভূতি স্ফুরিত হয়ে উঠে?

এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে, এই সব চরিত্রের যিনি স্রষ্টা সেই বিভূতি-ভূষণের ব্যক্তি-চরিত্রের প্রবণতার মধ্যে। বিভূতিভূষণ ছিলেন আড়ম্বরহীন সরল শান্ত প্রকৃতির এক উদাস, নির্লিপ্ত মানুষ। মানুষের সমস্ত দুঃখ-দ্বন্দ্ব-

সংঘর্ষকে স্বীকার করে নিলেও, কেবল তারই মধ্যে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। তাদের অতিক্রম করে এক সামগ্রিক জীবন-চেতনায় তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল—যে-জীবন সহজ অকৃত্রিম অথচ গতিশীল। জীবন মানে কেবল দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নয়, জীবনের আসল রূপ তার গতির মধ্যে, তার পথিক-রূপের মধ্যে। জীবন ও মানুষ সম্পর্কে এই উপলব্ধিই বিভূতিভূষণকে কিছুটা উদাসীন বাউলের ভাব দান করে ছিল। আর তাঁর এই স্বভাবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিফলন হয়েছে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্রগুলির ওপর।

যদু মাষ্টার বা হাজারী ঠাকুরের জীবনে বা চরিত্রে যে দ্বন্দ্ব নেই, একথা বলা চলে না। বিচিত্র বিরুদ্ধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের চলতে হয়েছে। তার ফলে তাদের মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়াও নেহাৎ কম হয়নি। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ যদু মাষ্টারের বিপর্যস্ত নীতিবোধ ও আত্মসম্মান-চেতনার অভাব এবং হোটেল-গড়ার স্বপ্নকে সফল করার পথে হাজারীঠাকুরের জীবনের অজস্র বাধা-বিপত্তি, তাদের চরিত্রকে দ্বন্দ্ব সংঘাত-ক্ষুব্ধ বাস্তবতা দান করেছে। কিন্তু তবু মনে হয় যেন, এহ বাহ্য। যদু মাষ্টার বা হাজারী ঠাকুরের চরিত্রে যতই দ্বন্দ্ব বা বাধা বিপত্তি থাক, পাঠক-মনে তাদের যে সামগ্রিক আবেদন, সেটা নিছক সাধারণ দ্বন্দ্ব-মুখর বাস্তবতার নয়। সে আবেদনের মধ্যে লেখকের লিরিকধর্মী উদাস-করুণ এক সহজ সুরমাধুর্য মিশে আছে।

তাই বলছিলাম, চরিত্র সৃষ্টির কোন বাঁধাধরা পথ নেই। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন পথ। বিভূতিভূষণের মনের যে বিশিষ্ট গঠন, সেই অনুযায়ী তাঁর উপন্যাসের নরনারীর চরিত্ররূপ অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হয়েছে। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের পক্ষেই তাঁর মানসিক গঠন, উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ প্রভাবশীল। জীবনে যা' কিছু দেখেন, যা' কিছু তাঁর অভিজ্ঞতা, সব কিছুই লেখক তাঁর রচনায় স্থান দিতে পারেন না—সে ক্ষমতাই তাঁর নেই। তিনি কেবল সেটুকুই তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যেটুকু তাঁর মানস-পরিধির মধ্যে পড়ে। তাঁর মন যেটুকু গ্রহণ করতে পারে, অনুভব করতে পারে, শুধু সেটুকু। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ-সমালোচক লিডেল-এর মন্তব্য স্মরণীয় :

"What is important to an artist, is not his experience but his range." [A treatise on the Novel.]

কথার পিঠে কথা এসে পড়ে। তাহলে কি একথা মেনে নিতে হবে যে, যেকোন ধরণের একটা চরিত্র-সৃষ্টি করলেই তা সার্থক বলে গৃহীত হবে? উপন্যাসে সার্থক চরিত্র-সৃষ্টির খাঁটি লক্ষণটা তাহলে কী?

পাঠক-মনে চরিত্রগুলিকে বাস্তব ও সম্ভাব্য ব'লে ধারণা জন্মে দেওয়াই সার্থক চরিত্র-সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ। আসল রহস্য। সন্ন্যাসী, খুনী, মাতাল, শিল্পী, চোর, আদর্শবাদী—যে কোন ধরণের চরিত্রই হ'ক না, উপন্যাসের ঘটনার মধ্য দিয়ে তাকে এমনভাবে পরিস্ফুট করতে হবে, যাতে পাঠক মন তাকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে পারে। চরিত্রটির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সকল অবিশ্বাস ও সংশয় দূর হয়ে গিয়ে ('Suspension of disbelief') পাঠক মনে যদি একটা 'illusion of reality' জেগে ওঠে, তখনই নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, চরিত্রটি স্বাভাবিক ও শিল্প-সম্মত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলিকে এই লক্ষণ-বিচারের আলোয় নিরীক্ষণ করলে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশ নরনারীই স্বাভাবিক ও শিল্প-সংগত রীতিতেই সৃষ্ট হয়েছে। আদর্শবাদী অপু থেকে সুরু করে অতিসাধারণ যদু মাষ্টার, হাজারী ঠাকুর, সীতা, সর্বজয়া সবাই পাঠক মনে 'বাস্তবতার মোহ'-সৃষ্টিতে সিদ্ধকাম।

বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে illusion of reality মোটামুটি বর্তমান থাকলেও, সব চরিত্রই কিন্তু এক ধরণের নয়। অর্থাৎ একই ধরণের বাস্তব পরিবেশ বা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে তারা সকলে জন্ম নেয়নি। তাঁর উপন্যাসে দেখি, কোথাও পরিবেশ যথেষ্ট বাস্তব কিন্তু চরিত্রগুলিতে স্বপ্ন ও আদর্শ চেতনার স্পর্শ লেগেছে (অপু ও জিতু চরিত্র)। কোথাও বা অপরিচিত রহস্যগভীর পটভূমিতে নিতান্ত সজীব বাস্তব নরনারীর চিত্র ফুটে উঠেছে (রাজু পাঁড়ে, মটুকনাথ, মঞ্চী ইত্যাদি চরিত্র স্মরণীয়)। আবার কোথাও বা পরিবেশ ও চরিত্র দুই-ই মোটামুটি বাস্তব-অনুযায়ী হয়েছে (যদু মাষ্টার, আলম, পদ্মঝি, সর্বজয়া)।

এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বাস্তবতা, একটু বিচিত্র ধরণের এক মিশ্র বাস্তবতা। মিহি ও মোটা তারের সমন্বয়ে তিনি জীবনের এমন এক মিশ্ররাগ রচনা করে গেছেন, যার মধ্যে রোমান্স, আদর্শবাদ ও বাস্তব জীবনসমস্যা এক বিস্ময়কর সংগতি লাভ করেছে।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সাধারণতঃ যে তিনশ্রেণীর চরিত্রের দেখা মেলে, তাদের কথা উপরেই উল্লেখ করেছি। এদের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ মোটামুটিভাবে বাস্তবধর্মী উপন্যাসের প্রচলিত ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রভাব এই সব চরিত্রসৃষ্টিতে সহজেই চোখে পড়ে। বাঙলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের সুখদুঃখের ছবি আঁকতে শরৎচন্দ্রের জুড়ি মেলে না। অত্যন্ত সহজ কথায়, ঘরোয়া ভঙ্গীতে তিনি চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। হরিহর রায়, যদু মাষ্টার, প্রসন্ন গুরুমশাই, জিতুর দাদা, স্কুলশিক্ষক নারায়ণ বাবু—সবাই যেন শরৎসাহিত্যের সেই বিশিষ্ট এক সহজ, ঘরোয়া পথ অনুসরণ করেই আবির্ভূত হয়েছে। এধরণের চরিত্রসৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ যে শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত পথই মোটামুটি ভাবে অনুসরণ করেছেন, তার একটি কারণ আছে। কারণ এই যে, বিভূতিভূষণের মানসকল্পনার স্বাভাবিক উল্লাস প্রকৃতি বা অধ্যাত্মচেতনার পটভূমিতে মানুষের জীবন-উপলব্ধিতে। কিন্তু পূর্বোক্ত চরিত্রগুলির মধ্যে সেই মহত্তর জীবন-পট নেই। এরা নিতান্তই সহজ সাধারণ সামাজিক মানুষ। বিভূতিভূষণ এধরণের মানুষের চরিত্র, এদের জীবনের নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলেন না। এদের সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিনব, মৌলিক উপলব্ধি হয় নি। অথচ এদের একেবারে বাদ দিয়ে সার্থক জীবনধর্মী কথাসাহিত্যও সৃষ্টি করা যায় না। কারণ এই 'সাধারণ' মানুষই সমাজের পনেরো-আনা অংশ। এদের জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাক্ষার ছোট ছোট ঢেউয়ের আঘাতে সমাজ-মানস নিরন্তর আন্দোলিত হচ্ছে। তাই বিভূতিভূষণ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন প্রচলিত পথ আশ্রয় করতে। শরৎচন্দ্রের পথ।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে যে বিপুল সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চোখে পড়ে, উদাসীন অধ্যাত্ম-প্রাণ শিল্পী বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলি সেদিক থেকে এক রকম দ্বন্দ্বরহিত। এমন কি কুটবুদ্ধি, শয়তান চরিত্রগুলিও ('কেদার

রাজা'র প্রভাস, 'অনুবর্তনে'র আলম) দ্বন্দ্ব বা তীব্রতার অভাবে, সজীব হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন অনুজ্জ্বল ও অস্ফুট থেকে গেছে। মাঝে মাঝে তাদের স্বভাবে এমন একটি সরলতা প্রকাশ পেয়েছে, যা শয়তান প্রকৃতির মানুষের কাছে আদৌ প্রত্যাশিত নয়।

পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টিতে কিন্তু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা ও রচনার নৈপুণ্য অনেক বেশি পরিস্ফুট। আগেই বলেছি, প্রকৃতির পটভূমিতে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ছবি আঁকতে বিভূতিভূষণের সহজাত একটি প্রবণতা ও প্রতিভা আছে। নিছক সমাজবদ্ধ মানুষের দুঃখসমস্যার চিত্ররচনায় সেই প্রতিভার সম্যক্ প্রকাশ হয় নি। কিন্তু 'আরণ্যক' উপন্যাসের অপরিচিত এক আদিম পৃথিবীর নরনারীর বলিষ্ঠ, সরল ও অকৃত্রিম জীবনের রসকল্পনায় তা বিস্ময়করভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে মনে পড়ে। তিনি শুধু প্রকৃতির কথা বলেন নি, প্রকৃতির রহস্য-গভীর পটভূমিতে মানুষের কথাও বলেছেন, যে মানুষের সমাজ নেই, কিংবা পাহাড়-অরণ্যই যার সমাজ, যে মানুষ প্রকৃতির দুর্যোগ-দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মানুষ মহৎ, সরল এক নির্জন মানুষ। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতির আদিম রহস্যময় অপরিচিত পরিবেশে যে অসংখ্য নরনারীর জীবনচিত্র রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় চরিত্র ও জীবনকল্পনার কোথায় যেন একটি গভীর সাদৃশ্য আছে। একই ধরণের আদিম রহস্যগম্ভীর, অথচ একান্ত সরল ও বাস্তব।

'আরণ্যক' উপন্যাসে অজস্র মানুষ। এরা প্রায় সবাই দরিদ্র সরল অতিসাধারণ। কঠোর পরিশ্রম করে এদের অন্ন সংস্থান করতে হয়। এই অমানুষিক দারিদ্র্য কিন্তু এদের জীবনকে অসন্তোষের আগুনে নিরন্তর দগ্ধ করে না। এক গভীর আত্মতৃপ্তির মনোভাব এদের চরিত্রকে এক অনাড়ম্বর মহত্ত্ব দান করেছে। অভাব ও কঠিন জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে এরা আর একটি বস্তুকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করেছে। অন্ধ কুসংস্কার। বুনোমহিষের দেবতা 'টাঁড়বারো', অলৌকিক কুকুর-কাহিনী, জীনপরী 'ডামাবাণু', উদয় পাহাড়ের গুহা থেকে সূর্যের আবির্ভাব ইত্যাদি অসংখ্য অন্ধ বিশ্বাসের আবহাওয়ায় এরা সকলেই মানুষ হয়েছে। সহজ সাধারণ এই সব মানুষের টুকরো টুকরো ছবি, এই 'short simple annals of the poor',

'আরণ্যকে'র অপরিচিত রহস্তময় পটভূমিতে সন্নিবিষ্ট হয়ে এক অসাধারণ মহিমা ও সৌন্দর্য লাভ করেছে। আসলে রাজু পাঁড়ে, মটুকনাথ, ধাতুরিয়া, কুন্তা, মঞ্চী—এরা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। এদের চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, উত্তুঙ্গ আদর্শচেতনা কি সৌন্দর্যবোধ কিছুই নেই। বিহার বা মধ্যপ্রদেশের কোন জনবহুল নাগরিক পরিবেশে এদের যদি নিয়ে আসা যায়, তাহলে চরিত্র হিসেবে এদের সমস্ত আকর্ষণীশক্তি মুহূর্তের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু লবটুলিয়া, নাড়া বইহারের ওই আদিম আরণ্য পরিবেশের প্রভাবে, ওই পাহাড়-অরণ্যের রহস্ত-নিবিড় সুদীর্ঘ ছায়াসম্পাতে ওই অতিসাধারণ মানুষগুলি যেন মুহূর্তের মধ্যে এক একটি অসামান্য চরিত্র হয়ে উঠেছে।

অনেকে বলেন, 'আরণ্যক' উপন্যাসে পটভূমির চাপে মানুষ সংকুচিত হয়ে গেছে। লেখক প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে এমনি তন্ময় হয়ে পড়েছেন যে তাঁর চোখে মানুষ অনেকখানি অনাদৃত অবহেলিত। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি ও মানুষের এই সামঞ্জস্যের অভাব অনেকের দৃষ্টিকে পীড়িত করেছে।

কিন্তু বস্তুতঃ এটি লেখকের ত্রুটি নয়। বরং পক্ষান্তরে, এই তথাকথিত 'অসামঞ্জস্য' বিভূতিভূষণের গভীরতর শিল্পবোধেরই ইঙ্গিত দেয়। 'আরণ্যকে' অরণ্য ও পর্বতের যে বিশাল-গম্ভীর-রহস্যময় রূপের পরিচয় আছে, প্রকৃতির সেই সুবৃহৎ প্রভাবশীল রূপের পটভূমিতে মানুষের জীবন কখনও স্বাতন্ত্র্যবাদী, গতিচঞ্চল হতে পারে না। মানুষের জীবন ও চরিত্র সেখানে প্রকৃতির রহস্যময় প্রবল শক্তির প্রভাবে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হবে, এটা স্বাভাবিক। 'আরণ্যকে'-ও তাই ঘটেছে। মানুষের জীবন সেখানে মন্থর ধারায় বয়ে চলে। সে জীবনে বৈচিত্র্য নেই, কোন ছন্দোমাধুর্য নেই। খাপছাড়া ভবঘুরে কতকগুলি সহজ সরল মানুষের ভিড় সেই আদিম আরণ্যজগতে। প্রকৃতি তাদের জীবনকে নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। দুর্বৃত্ত মানুষ প্রকৃতির স্নিগ্ধ-ছায়ায় নাগরিক-সুলভ কুটিলতা ভুলে মুখোশহীন অকৃত্রিম দুষ্কৃতকারীতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির প্রভাব এমনই বিস্ময়কর যে ধাওতাল সাহু মহাজন হয়েও লোভী অর্থপিশাচ নয়। সরল সহৃদয় মানুষ। বেঙ্কটেশ্বরের মতো আপন-ভোলা কবি, মটুকনাথের মতো বাস্তববুদ্ধিহীন শিক্ষক, যুগলপ্রসাদের মতো শিল্পপ্রাণ উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞ—এদের সকলের চরিত্রের উপরেই প্রকৃতির অকৃত্রিম অপাপবিদ্ধ ও লোকোত্তর প্রভাবের সক্রিয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই সব প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত চরিত্র-গুলির সৃষ্টিমূলে কিন্তু আর একটি মূল্যবান্ প্রভাব আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সেটি স্বয়ং লেখকের চরিত্র ও জীবনদৃষ্টির অসামান্য প্রভাব। বিভূতিভূষণের সরল রূপমুগ্ধ ও প্রীতিস্নিগ্ধ কবিদৃষ্টি অরণ্যচারী ওই আদিম প্রকৃতির মানুষগুলির চরিত্র-পরিকল্পনায় অনেক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে। লেখকের ব্যক্তিসত্তার এই প্রভাব যদি আরণ্যক চরিত্রগুলিকে কিছুমাত্র প্রভাবিত না করিত, তাহলে হয়ত আমরা ধাওতাল সাহুর বদলে পেতাম এক অর্থপিশাচ নিষ্ঠুর মহাজনকে, যে অর্থলালসায় নরহত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করে না। তাহলে হয়ত কুন্তা বা মঞ্চীকে অবলম্বন করে আদিমবৃত্তির এক অমানুষিক দানব-লীলা প্রত্যক্ষ করতাম। 'আরণ্যকে'র বদলে পেতাম হাডসনের 'Green Mansions'.

আমাদের সৌভাগ্য তা পেতে হয় নি। বিভূতিভূষণের উদার মুক্তি-পিপাসু অকৃত্রিম স্বভাবের সঙ্গে বিশাল প্রাণময়ী প্রকৃতির কোথায় যেন এক নিবিড় সঙ্গতি আছে। তাই 'আরণ্যকে'র চরিত্র গঠনে প্রকৃতি ও লেখকের প্রভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দু'টিকে আর বিচ্ছিন্ন করে চেনা যায় না।

'আরণ্যকে'র চরিত্রগুলি প্রকৃতির বিশাল সংহত প্রভাবে অনেক পরিমাণে সংকুচিত হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু তারা স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত নয়। বিভূতিভূষণের ব্যক্তি-মনের আলোয় তারা কিছুটা আলোকিত হলেও তাদের আদিম অসংস্কৃত বন্য রূপটি অবিকৃত থেকে গেছে। তারা সহজ শান্ত অকৃত্রিম হলেও তারা যে আদিম পৃথিবীর বংশধর, তারা যে গৃহহীন যাযাবর হাঁসের দল, ঔপন্যাসিক একথা এক মুহূর্তকালের জন্যেও বিস্মৃত হ'ন নি। আর শুধু তাই নয়, তিনি একথাও জানেন যে এরা সবাই সরল সহজ হলেও, এদেও সকলের স্বভাব বা প্রবণতা ঠিক এক ছাঁচে ঢালা নয়। তাই 'আরণ্যকে'র চরিত্রগুলি অনেকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি মনে হলেও, আসলে তা নয়। মটুকনাথ, বেঙ্কটেশ্বর, দোবরু পান্না, রাজু পাঁড়ে, গণু মাহাতো, ধাতুরিয়া, এরা আপন আপন সুখ দুঃখ আশা স্বপ্ন বিশ্বাস নিয়ে প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিচরিত্র।

বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যে বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট সবরকম চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসা ও জনসম্বর্ধনা লাভ করেছে

তাঁর অধ্যাত্মপ্রবণ অন্তর্মুখী চরিত্রগুলি। এ ধরণের চরিত্রের মধ্যে অপু ও জিতুর কথা সকলের আগে মনে আসে। বিশেষ ক'রে অপুকে।

বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র অপু। কল্লোল-গোষ্ঠীর সেই সংশয়-ক্ষুব্ধ ও ফ্রয়েড-মার্কস্-এর উগ্র উত্তেজক মতবাদে উদ্‌ভ্রান্ত-জীবনদৃষ্টি ও মানস-প্রবণতার বিরুদ্ধে যেন এক নীরব অথচ বলিষ্ঠ 'চ্যালেঞ্জ', বিভূতিভূষণের এই আশ্চর্য চরিত্রটি। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের প্রায় সকল স্তরের পাঠকই অপুকে এক উদাসীন, নিসর্গ-প্রেমিক, অধ্যাত্ম-প্রবণ শিল্পী-চরিত্র হিসেবে অনুভব করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী বা উপলব্ধি মিথ্যা, একথা আমিও বলিনে। বিভূতিভূষণের সমগ্র শিল্পী-সত্তা যেন এই একটি চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, একথা আরও অনেকের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করি। বিভূতিভূষণের মনে দেশ ও কালের যে বৃহৎ চেতনা আছে, যে অন্তহীন পথিক সত্তা আছে, সবই অপু চরিত্রের মধ্যে এক বিস্ময়কর সমন্বয় লাভ করেছে।

এ সবই সত্য। আরও সত্য এই যে, অপুর জীবন, প্রকৃতি ও মানব-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমোন্মেষের কাহিনী। তার জীবন রোমান্টিক বিস্ময় ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পথ পেরিয়ে মিস্টিক উপলব্ধিতে পৌঁছেছে। শেষ পর্যন্ত সে জীবনের খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে এক অখণ্ড জীবনের অমৃত-আস্বাদ পেয়েছে, যে জীবন কোন সংকীর্ণ দেশ বা কালে আবদ্ধ নয়, অগণিত নক্ষত্রলোক ও অন্তহীন মহাকালের মধ্যে যে জীবন ও জগৎ বিসর্পিত, অপু নিজেকে সেই মহাবিশ্বের একজন নাগরিক বলে অনুভব করেছে।

অপু-চরিত্রের এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা সবাই মোটামুটি একমত। কিন্তু অপুকে কেবল বিভূতিভূষণের একটি কি দুইটি উপন্যাসের নায়ক চরিত্র হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলেই চলবে না। তাকে সেই যুগের (যে-যুগে 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত' লেখা হয়েছিল) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। তাহলেই তার প্রকৃত মূল্য ও গুরুত্ব নির্ধারণ করা যাবে।

আগেই বলেছি, অপু-চরিত্র কল্লোল গোষ্ঠীর কাছে একটি নীরব অথচ বলিষ্ঠ 'চ্যালেঞ্জ'। জীবনকে যাঁরা প্রধানতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও মার্ক্সীয় অর্থনীতির ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করছিলেন, জীবনের মূল্য ও মহিমা সম্পর্কে ক্রমশঃ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছিলেন, তাঁদের কাছে,

আর সেই সঙ্গে তৎকালীন সমস্ত বাঙালী পাঠকের কাছে এই বিস্ময়কর চরিত্রটি মনুষ্যত্বের নতুন মূল্যমান ও মহিমা নিয়ে আবির্ভূত হ'ল। সুতরাং অপু চরিত্র কেবল নিজের নীরব মাধুর্য ও অন্তর্মুখী জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, একটি বিশেষযুগের সন্ধিকালে সে সাধারণ মানুষের পিপাসা ও প্রত্যাশাকে ভাষা দিয়ে নতুন আশা আশ্বাস জাগিয়েছে। এদিক থেকেও তার একটি মহৎ মর্যাদা আছে।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। অপু-র মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ মনুষ্যত্বের মহান মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করেছেন একথা সত্য, কিন্তু অপু নিজে মোটামুটিভাবে নিষ্ক্রিয় বা passive চরিত্র। বাইরের জগতে সে কোনকিছুর বিরুদ্ধে তেমন সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করেনি। তার নিজের মধ্যেও প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিক্ষোভও তেমন নেই। তবে একথা সত্য যে মনের জগতে সে আদৌ নিষ্ক্রিয় নয়।

প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে বিচিত্র পরিচয় তার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের ওপর সুগভীর চিহ্ন রেখে গেছে। তার শিশুমন সহজাত intuition আশ্রয় করে সেই চিহ্নিত পথ বেয়ে বেয়ে ক্রমশঃ জীবনের গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করেছে।

অপুকে প্রথম দর্শনে মনে হয়, পাড়াগাঁর নগণ্য এক শিশু। কিন্তু ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের 'Prelude' কাব্যের সেই বিস্ময়কর শিশুর মতো তার মধ্যেও যে মহৎ সম্ভাবনার বীজ ছিল, তা ক্রমশঃ প্রকাশ পেয়েছে। লেখক ধীরে ধীরে আপাত-তুচ্ছ নিসর্গ সৌন্দর্য ও বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে অপুর জীবনের মহৎ উপলব্ধির ছবি তুলে ধরেছেন। তার ফলে, অপুকে কোথাও অলৌকিক বা অস্বাভাবিক মনে হয় না।

আর একটা কথা বলে অপুর প্রসঙ্গ শেষ করি। অনেকে রোমাঁ রল্যাঁর জাঁ ক্রিস্তফ চরিত্রের সঙ্গে অপু-চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা শেষোক্তটির ওপর প্রথম চরিত্রের প্রভাবও কল্পনা করে থাকেন।

দুখানা গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য চোখে পড়ে, একথা সত্য। দু'খানাই 'এপিক' গোত্রীয় উপাখ্যান ('পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-কে একত্রে একটি উপন্যাস বলে মনে করছি।) এক আদর্শবাদী জীবন-জিজ্ঞাসু-শিল্প-প্রাণ নায়কের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও মহৎ উপলব্ধির কাহিনী দু'টি উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু রচনা করেছে।

কিন্তু তবুও ক্রিস্তফ অপু নয়। ক্রিস্তফ শিল্পী, কিন্তু দেহে-মনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ, হয়ত বা একটু উগ্রধরণের। তার সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে সক্রিয়। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিকালে য়ুরোপীয় সমাজ ও জীবনের গভীরে যত গ্লানি ক্লেদ ও অসত্যের পঙ্কস্তর জমে উঠেছিল, ব্যক্তি পুরুষের যে বিরাট অপচয় ঘটছিল, ক্রিস্তফ তার সমগ্র শক্তি ও কঠিন আত্মবিশ্বাস নিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। য়ুরোপের বহির্জীবনের পাপ ও অসত্যের অন্তরালে যে মহৎ বিবেক-বোধ প্রচ্ছন্ন ছিল, জাঁ ক্রিস্তফ যেন তারই শরীরী রূপ।

অপুর মানস-গঠন ও জীবন-পরিবেশ এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অপুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট বটে, কিন্তু সে সমাজের বিরুদ্ধে তার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন সংগ্রাম করেনি। সে শান্ত, নির্লিপ্ত, নির্জন। সে প্রকৃতির গভীরতর সৌন্দর্যের মুগ্ধ উপাসক। এবং তারি মধ্য দিয়ে জীবনের নিগূঢ়তম তাৎপর্যকে সে অনুভব করেছে।

ক্রিস্তফের সঙ্গে অপুর তাই মূলগত কোন নিবিড় ঐক্য নেই। অপুর ওপর ক্রিস্তফের প্রভাবও তাই দুর্লক্ষ্য মনে হয়। আসলে অপু একক, স্বতন্ত্র ও অনন্য।

'দৃষ্টিপ্রদীপে'র নায়ক জিতুর মধ্যে অপুর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু চোখে পড়ে। কিন্তু অপুর তুলনায় জিতু অনেক অগভীর, ছক-বাঁধা চরিত্র। প্রকৃতির তুচ্ছ উপকরণ, আশশ্যাওড়া, সজনে গাছ টুনটুনি পাখী, বিকেলের রাঙা রোদ—এর মধ্যে অপু আপন স্বতঃস্ফূর্ত রসদৃষ্টির মহিমায় যে মহাজীবনের আস্বাদ পায়, যে সুগভীর রূপচেতনায় তার মন শুদ্ধ হয়, জিতু চরিত্রে সেই সূক্ষ্ম সংবেদী শিল্প-বোধের পরিচয় তেমন মেলে না। জিতুর সৌন্দর্যবোধ ও জীবনচেতনা, অতিরিক্ত অধ্যাত্ম-বিশ্বাস ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। অপুর তুলনায় জিতু অনেক বেশী পার্থিব। অপুর চেয়ে তার নারী-প্রেমলিপ্সা ও নীড়-তৃষ্ণা অনেক স্পষ্ট, অনেক তীব্র। কিন্তু একদিকে প্রেম পিপাসা, অন্যদিকে অধ্যাত্মপ্রবণতা—এই দুই বৃত্তির সংযোগ তেমন অনিবার্য ও সার্থক হয়ে ওঠেনি। যদি তা' হ'ত. তাহলে বাঙলা সাহিত্যে জিতু অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতো। কিন্তু তা হয়নি। বরং নানা বৃত্তির মিশ্রণ ঘটাতে গিয়ে জিতুর উদাসীন পথিক রূপটিও অস্পষ্ট, বিবর্ণ হয়ে গেছে। অথচ লেখক ধ্যানদৃষ্টিতে জিতুর এই রূপকেই মূলতঃ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, এটা বোঝা যায়।

তাহলেও একথা সত্য যে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জিতু প্রক্ষিপ্ত নয়। ঔপন্যাসিকের জীবন দৃষ্টির স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করেই তার আবির্ভাব। সেই ধারাপ্রবাহকেই মোহানায় উত্তীর্ণ করে দিতে। অপু চরিত্রের মধ্যে অধ্যাত্ম-চেতনার উন্মেষের যে ছবি আছে, তারই ক্রমবিকাশের কাহিনী যেন জিতুকে আশ্রয় করেই লেখক বলতে চেয়েছেন। অধ্যাত্মচেতনা যে কোন অলৌকিক তত্ত্বসন্ধান নয়, এই মাটির পৃথিবীর চঞ্চল জীবনস্রোত, এখানকার মানুষের সুখদুঃখ, স্নেহমমতা, বিরহ-মিলনের নিবিড়তম উপলব্ধির মধ্যেই যে অনির্বচনীয় দিব্যচেতনার জন্ম, জিতুর জীবন-কথা যেন সেই সত্যেরই প্রতিলিপি। হয়ত জিতু চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক এই মহৎ সত্যের সার্থক শিল্পরূপ দিতে পারেন নি। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্-মুহূর্তে তাঁর ভাব-লোকে জিতুর এই মহৎ রূপই উদ্ভাসিত হয়েছিল। এতে সন্দেহ নেই।

সেই মূল ভাবকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে অপু ও জিতু স্বতন্ত্র চরিত্র নয়। জিতু যেন অপুর-ই পরিপূরক। হয়ত কিছুটা অক্ষম, দুর্বল। তবু পরিপূরক ত' বটে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রগুলির মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করে তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। তাঁর নারীচরিত্রগুলি সম্পর্কে এবারে কিছু বলা প্রয়োজন।

নারীচরিত্র সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণের প্রতিভা তেমন স্ফূর্তি লাভ করে নি। নারীজীবনের গোপন-রহস্যমোচনে শরৎচন্দ্র যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, নারীজীবনের দুঃখ-বেদনা-বঞ্চনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার যে মর্মস্পর্শী বাস্তব কাহিনী রচনা করে গেছেন, বিভূতিভূষণ যেন অনেক পরিমাণে সেই পরিচিত পথেই সঞ্চরণ করেছেন। নারীজীবনের নতুন কোন রহস্যের দ্বার তিনি উন্মোচন করেন নি।

বাঙলাদেশের মেয়েদের জীবনের যে অসহায় রুদ্ধ মর্মবেদনা—বিভূতি-ভূষণের সহৃদয় মরমী মন তাকে নানা আখ্যান ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র সীতা, 'অপরাজিত'-র লীলা, পটেশ্বরী,

'কেদার রাজা'র শরৎ সুন্দরী এবং 'মৌরীফুল' কি 'বেণীগির ফুলবাড়ী'র মতো অনেক গল্পগ্রন্থের অজস্র নারীচরিত্রের মধ্যে সমাজের নানা অনাচার অত্যাচার ও নিপীড়নের ছবি প্রত্যক্ষ সত্যের মতো সজীব হয়ে উঠেছে। এই সব চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের যে নির্যাতনের ছবি ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চিত্র বা চরিত্রের সাদৃশ্য আছে একথা স্বীকার করি। কিন্তু তা'ব'লে একথা কখনই বলা চলে না যে, তিনি শরৎচন্দ্রের অন্ধ অনুকারী। নির্যাতিত নারীচরিত্র সম্পর্কে তাঁরও বাস্তব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। এ সব চরিত্র সেই অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে। চরিত্র-সৃষ্টিপদ্ধতির সহজ আন্তরিক রূপ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

নারীর জীবনে প্রেম একটি বিস্ময়কর প্রভাব। তাই নারী চরিত্র রচনায় জীবনের এই গূঢ়, গোপন ও প্রগাঢ় বৃত্তিটির একটি মূল্যবান্ ভূমিকা আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের উপন্যাসে বা ছোট গল্পে নরনারীর প্রেমের স্থান একান্ত সংকীর্ণ। তাঁর শিল্পলোকে মানুষের বহুবিচিত্র অনুভূতির গভীরতম প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু নিজের ব্যক্তিচরিত্রে প্রেমদৃষ্টির গভীরতা ও আস্বাদের অভাবের ফলে তাঁর সাহিত্য বিচিত্রবর্ণ প্রেমের জটিল মনঃ-সমীক্ষায় সমৃদ্ধ নয়। নারীচরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রকে পূর্বসূরী হিসেবে গ্রহণ করেছেন বিভূতিভূষণ। তবু শরৎ-সাহিত্যের এই উজ্জ্বল, দূরপ্রসারী দিগন্তটি তাঁর রচনায় নিতান্তই ধূসর ও উপেক্ষিত হয়ে আছে। এমন যে হয়েছে, তার অনেক কারণ। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিপ্রবণ, নির্জন, উদাসীন স্বভাবের মানুষ। তাঁর মনের ভিতর কোথায় যেন একটি ঘরছাড়া বিবাগী বাউলের বাস। অপাপবিদ্ধ, দেবোপম একটি সরল শিশুহৃদয় তাঁর সমগ্র সত্তায় এমন ওতপ্রোত সঞ্চারিত ছিল, যার ফলে রহস্যময়ী নারীর প্রণয়লীলার জটিল মনোবিশ্লেষণ তাঁকে কখনও গভীরভাবে আকর্ষণ করে নি। অবশ্য, সেই জটিল মনোলোকের অতলে প্রবেশের শক্তি বা মানসিক প্রস্তুতিও তাঁর ছিল না, একথাও সত্য। কারণ, যেখানেই তিনি এ বিষয়ে সামান্য চেষ্টা করেছেন, যেমন 'বিপিনের সংসার' কি 'অথৈ জল', সেখানে তাঁর ব্যর্থতাই যেন প্রমাণিত হয়েছে।

যেখানেই তিনি তরুণী নারীর চিত্র এঁকেছেন, সেখানেই তারা সেবা, দয়া, স্নেহ ও আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বৈদ্যুতী প্রেমের তীব্রতাভরা প্রিয়া কি প্রেয়সীর চরিত্র তাঁর সাহিত্যে মেলে না। প্রেয়সীর

ছদ্মবেশে তাঁর সব নারী চরিত্রই হয় স্নেহময়ী জননী, নয়তো কল্যাণময়ী ভগিনী।

আর যে সব নারীর জীবনেও প্রেম অঙ্কুরিত হয়েছে, প্রেমের সামান্যতম যৌবনলীলাও আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানেও দেখি, লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় তেমন নেই। সবটুকুই প্রায় শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে ধার নেওয়া। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র মালতী ('শ্রীকান্তে'র কমললতাকে মনে আনে), হিরণ্ময়ী, 'বিপিনের সংসারে'র মানী ও শান্তি একথা সত্য প্রমাণিত করবে।

নারী সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃত পরিচয় লেখক 'অপরাজিত'-র একস্থানে অপুর জবানীতে প্রকাশ করেছেন ঃ

"সে এই মঙ্গলরূপিনী নারীকেই সারাজীবন দেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী করুণাময়ী নারীকে ;—হয়ত ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা ভাসা ধরণের বলিয়া—অর্পণা দু'দিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের সুখ ও দুঃখ ও সদা জাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রাণুদি, নির্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী বধূ—সবই তাই। তাই যদি হয়, অপু দুঃখিত নয়, তাই ভালো, এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ানো, ভবঘুরে পথিক জীবনে সহচর সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশি মেশামেশি করিয়া তাহাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিবার সখ তাহার নাই,—সে যাহা পাইয়াছে, চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।" [৩৯৮-৩৯৯ পৃঃ]

নারীর এই 'মঙ্গলরূপিনী' 'করুণাময়ী' রূপের আলেখ্য-রচনায় বিভূতিভূষণ প্রধানতঃ শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এ কথা মিথ্যা নয়। সেদিক থেকে এই চরিত্রগুলির মৌলিকতা বা স্বতন্ত্রমূল্য হয়ত খুব বেশী নেই। কিন্তু অন্ততঃ একটি নারীচরিত্রসৃজনে বিভূতিভূষণ যে শিল্পশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। সে চরিত্র —সর্বজয়া।

'পথের পাঁচালী ও 'অপরাজিত', অপুর সর্বগ্রাসী দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার গাঢ় বর্ণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেখানে অন্য কোন চরিত্রই যেন তেমনভাবে

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের সুযোগ পায় না। সব চরিত্রকেই মনে হয় যেন অপুর পরিপূরক। অপুকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোলাই যেন তাদের অস্তিত্বের একমাত্র সার্থকতা।

শুধু সেই কারণেই বোধ হয় সর্বজয়া আমাদের চোখে কিছুটা উপেক্ষিত। নচেৎ, স্থিরভাবে উপলব্ধি করলে বোঝা যাবে যে সর্বজয়া কী আশ্চর্য এক বাস্তব চরিত্র-সৃষ্টি। প্রাক্-বিভূতিভূষণ যুগের বাঙলা সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সব মাতৃ- বা মাতৃকল্প-চরিত্রের দেখা মেলে, সেগুলির বেশীর ভাগই শ্রদ্ধা ও আদর্শের লোকোত্তর চেতনায় মহিমান্বিত। রবীন্দ্রনাথের আনন্দময়ী ('গোরা') বা শরৎচন্দ্রের বিশ্বেশ্বরী ('পল্লীসমাজ')—ভারতীয় মাতৃত্ববোধের চিরন্তন প্রতীক। কিন্তু এই মাতৃচরিত্রপরিকল্পনায় একটা বড় অভাব রয়ে গেছে সেটি মাতৃত্বের বাস্তব রূপ। এঁরা মাতৃত্বের আদর্শকে প্রকাশ করেছেন, একথা মিথ্যা নয়, কিন্তু বাংলা দেশের গরীব ঘরের দোষে-গুণে-জড়ানো, লোভে বঞ্চনায় কলহপ্রীতিতে, আবার বুক-ভরা অঢেল স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ আমাদের সেই ঘরোয়া মায়ের অত্যন্ত বাস্তব ছবিটি এঁদের মধ্যে তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি।

সর্বজয়া—বাঙালীর এই বাস্তব মাতৃকল্পনার এক পরিপূর্ণ সার্থক শিল্পরূপ। সর্বজয়ার স্বভাবে অনেক দোষ। অশিক্ষিত, গ্রাম্য নারীর সব ক'টি দোষই তার প্রকৃতিতে স্থান পেয়েছে। সে মুখরা, সংকীর্ণ স্বার্থচেতা। পরের জিনিষ না ব'লে নেওয়াকে সে অন্যায় মনে করে না, বৃদ্ধা অসহায় ইন্দির ঠাকরুণকে সে অকথ্য উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা করেছে। লেখক সর্বজয়া চরিত্রের এই দিকগুলি গভীর বাস্তবতায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য। সর্বজয়া চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য এখানে নয়। সর্বজয়া তার সমস্ত দোষ-ত্রুটি-গ্লানি থেকে মেঘমুক্ত সূর্যের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে তার মাতৃত্বের বিস্ময়কর মহিমায়। লেখক শিল্পবোধের চরম পরীক্ষায় সেখানেই সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন, যেখানে তিনি সর্বজয়া চরিত্রের দ্বৈতসত্তার—একটিতে তার তুচ্ছতা সংকীর্ণতা ও অজস্র ভুলত্রুটি এবং অন্যটিতে অপার অগাধ সন্তানস্নেহ—এই দুইরূপের সহজ সমন্বয় করতে পেরেছেন। অপু ও দুর্গাকে সর্বজয়া প্রাণের চেয়ে ভালোবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসা শান্ত স্থির উদার আকাশের মতো নয়। সন্তানের পক্ষ সমর্থনের জন্য তা' কখনো মৌসুমী ঝড়ের মতো অন্যের ওপর তীব্র কলহ ও তীক্ষ্ণ বাক্যবানরূপে নেমে

এসেছে, কখনো বা পুত্রকন্যার ওপরেই নিদারুণ তিরস্কার এমন কি নিষ্ঠুর প্রহারের ধারাবর্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত কিছু মালিন্য ও রুক্ষতাকে ছাপিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সর্বজয়ার প্রাণের গভীরে সন্তানের জন্য এক প্রগাঢ় ভালোবাসা সঞ্চিত ছিল। সে ভালোবাসার ব্যাপ্তি হয়ত' বেশী নেই। তা হয়ত' অন্ধ, সংকীর্ণ। অপুকে মনসাপোতার পুরোহিতের স্থায়ী কাজে নিযুক্ত ক'রে তার বিয়ে দিয়ে সংসারী করে তোলার সংকীর্ণ তুচ্ছ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আবর্তে হয়ত এই ভালোবাসা ডানা ঝাপটে মরেছে। কিন্তু তবু এই অসহায় স্নেহ, এই করুণ ভালোবাসা একান্ত গভীর। একেবারে অতলস্পর্শী। দুর্মূল্য মণিখণ্ডের মতো তা যেমন খাঁটি, তেমনি তার প্রখর দীপ্তি। প্রগাঢ় স্নেহের সেই দুর্লভ স্বর্ণদ্যুতিতে সর্বজয়ার চরিত্র আশ্চর্য মহিমা লাভ করেছে।

আরও কয়েকটি নারীচরিত্র-কল্পনায় বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মৌলিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'আরণ্যকে'র নারী চরিত্রের কথা ব'লছি। ভানুমতী, মঞ্চী, ও কুন্তার চরিত্রে-ও বিভূতিভূষণের অন্যান্য নারীর মতো সেবা, স্নেহ ও মমতার লক্ষণগুলিই পরিস্ফুট। কিন্তু তবু তাদের চরিত্রের ওপর আরেকটি রহস্যজগতের আলো এসে পড়েছে। সে আলো আদিম বন্য জীবনের শক্তি ও সৌন্দর্যের। সেই আলোর জ্যোতির্বলয়ে এই আপাত নগণ্য চরিত্রগুলির উত্তুঙ্গ শিল্পলোকের স্পর্শ পেয়েছে।

বস্তুতঃ 'আরণ্যকে'র পুরুষ চরিত্রের মতো নারী চরিত্রগুলিও স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে তেমন অসাধারণ কোন সৃষ্টি নয়। কিন্তু দূর দেশের অরণ্য-পাহাড়ের রহস্যময় আদিম পরিবেশ বাঙলা সাহিত্যের নারী চরিত্রের বিপুল জনপ্রবাহের মধ্যেও তাদের বিশিষ্টতা দান করেছে।

॥ বৈচিত্র্য ধর্ম ॥

শিল্পস্রষ্টা হিসেবে বিভূতিভূষণকে 'মহান্' না হ'ক, অন্ততঃ স্বতন্ত্রধরণের এক শক্তিমান্ প্রতিভা ব'লে বাঙলা দেশের পাঠক ও সমালোচক গোষ্ঠী স্বীকৃতি দিয়েছেন। অনেক তাঁর রচনাকে মহৎ সাহিত্যের বিরল মহিমাও দান করেছেন। বিভূতিভূষণের শিল্পকৃতির অজস্র নৈপুণ্য তাঁদের চোখে পড়েছে। তাঁর ব্যক্তি-পুরুষের আশ্চর্য মৌলিকতা এবং উত্তুঙ্গ অথচ সুগভীর জীবন-দৃষ্টির মহিমা বিদগ্ধ পাঠকের মনকে অভিভূত করেছে।

কিন্তু বিভূতিভূষণের অনুরাগী পাঠকগোষ্ঠীর মনেও একটি চাপা অভিযোগ আছে যে তাঁর রচনা নাকি বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখক একই সুরের পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন তাঁর সাহিত্য জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সে সুর যত উচ্চাঙ্গেরই হ'ক না, যত উঁচু তারেই তা বাঁধা থাক না কেন, ক্রমাগত একই ভঙ্গীতে তাকে বাজাতে থাকলে, তা পাঠকের স্নায়ু-তন্ত্রীকে কিছুটা পীড়িত করবেই।

যাঁরা আরও একটু উগ্রমতাবলম্বী, তাঁরা বিভূতিভূষণের এই বৈচিত্র্য-হীনতার কারণ দেখিয়ে বলেন, জীবনের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সরে এসে 'পলাতক শিল্পীর' মত জীবন-বিমুখ এক উদাসীন অধ্যাত্মচারী মনের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভূতির কাহিনী বিবৃত করেছেন। সেই সব কাহিনীর মধ্যে না আছে সমসাময়িক বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি, না আছে রক্তমাংসের সজীব নরনারীর দেহ-মনের উত্তাপ। সমালোচকেরা বলেন, তাঁর রচনা যে ক্লান্তিকর মনে হয় তার একটি প্রধান কারণ, তাঁর সাহিত্যে প্রেম কাহিনীর একান্ত অভাব। মানবমনের এই প্রবলতম, অতিনিগূঢ় বৃত্তিটি জীবনকে সরস সজীব ও বিচিত্র ক'রে তোলে। জীবনধর্মী উপন্যাসে তাই প্রেমের বিচিত্র ও নিবিড় লীলা-মাধুর্যের প্রকাশ। কিন্তু বিভূতিভূষণের উদাসীন, মিস্টিক মনের জগতে এর স্থান ছিল অতি সংকীর্ণ।

তাই বিরুদ্ধবাদী সমালোচকের দল হয়ত বিভূতিভূষণকে বৈচিত্র্যবাদী জীবনধর্মী ঔপন্যাসিক হিসেবে উচ্চ আসন দিতে চাইবেন না। বরং একতারা-হাতে এক বাউল কবি হিসেবেই তাঁকে অধিক স্বীকৃতি দেবেন।

অভিযোগটা বিচার করে দেখা দরকার। সত্যকার শিল্পীমনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—তার অসামান্য বৈচিত্র্য-পিপাসা। বিচিত্র রূপ ও সুর, বিচিত্র মানুষ ও আনন্দ-বেদনার অন্তহীন সমুদ্রে সেই মন অবাধে ভেসে চলে। যাঁরা গভীরতর চেতনার অধিকারী তাঁরা ওই বিচিত্রের মধ্যেই 'এক'-এর অনির্বচনীয় অনুভূতি লাভ করেন। কিন্তু জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে তাঁরা অস্বীকার করেন না। বিচিত্রকে সেই পরম ঐক্যশক্তির রূপ-বিভূতি বলেই গ্রহণ করেন। যিনি জীবনের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেন না, ভালোবাসেন না, কেবল সেই অদ্বৈত পরম ঐক্যশক্তিতেই যাঁর অচলা নিষ্ঠা, তিনি তত্ত্বজ্ঞ বৈদান্তিক হ'তে পারেন, কিন্তু কখনোই যথার্থ শিল্পপ্রাণ ন'ন।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যাঁরা বৈচিত্র্যের সন্ধান করেও ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁরা হয়ত জানেন না, শিল্পী হিসেবে বিভূতিভূষণকে তাঁরা কতখানি খাটো করে দিয়েছেন। তাঁকে একতারার একটি মাত্র সুরের ভাণ্ডারী হিসেবে গণ্য করে তাঁর জীবন-দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও শিল্পশক্তির চরম অক্ষমতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কারণ যে লেখক (এবং তিনি কথাশিল্পী!) জীবনে প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর সম্পর্কে বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগ, শিল্পী হিসেবে তাঁর চরম ব্যর্থতার নিদর্শন নয় কি?

এমন একটি মারাত্মক অভিযোগের প্রতিবাদ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এ ধরণের বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ পাঠকের মনকে প্রভাবিত করে বিপথগামী করতে পারে। বিভূতিভূষণ তথা বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে সে ধরণের ঘটনা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

এ'কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রকৃতি এক বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করে আছে। অজস্র রূপ ও বিপুল মহিমা নিয়ে অরণ্য-পর্বত ও সমুদ্র-মেখলা এক বিশাল প্রকৃতি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আদিগন্ত প্রসারিত হয়ে আছে। এক স্বপ্নমুগ্ধ পথিকের মত সারা জীবন তিনি এই মোহময়ী প্রকৃতির অনির্বচনীয় সংগীত রচনা করে গেছেন। প্রকৃতির সুর তাঁর রচনায় ধ্রুবপদের মতো বারবার বেজে উঠেছে। কিন্তু এই প্রকৃতি-চেতনা ও নিসর্গের রূপ-বর্ণনার মধ্যেও লেখক সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি-চিত্রের তুলনা করলেই কথাটি স্পষ্ট হ'বে। বাংলার শান্ত শ্যামল পল্লীপ্রকৃতির যে সহজ সৌন্দর্য, তা' শিশু অপুর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাঠকহৃদয়কে যে উদাস-করা

চলমান জীবনানুভূতির বিস্ময়রসে ভ'রে তোলে, তার সঙ্গে 'আরণ্যকে'র আদিম রুক্ষ বিশাল, পার্বত্য বনপ্রকৃতির রহস্য-মগ্ন সৌন্দর্যবোধের কোন প্রভেদ নেই কি? 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি কি একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি মাত্র, না, একটি অপরটির পরিপূরক? কিশোর বাঙলার পল্লী-প্রকৃতি ও বিহারের আদিম আরণ্য চিত্র, দু'য়ে মিলে প্রকৃতির বিচিত্র ঐশ্বর্যের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপই কি আমাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে না?

কিন্তু কেবল প্রকৃতি নিয়েই জীবন সম্পূর্ণ নয়। জীবনের পূর্ণ ছবি আঁকতে হলে মানুষের কথা, বিচিত্র মানুষের বিচিত্রতর আনন্দ-বেদনার কথা বলতে হয়। জীবনবাদী শিল্পী বিভূতিভূষণ-ও তা' বলেছেন। মানবচরিত্রের নানা বিপরীতমুখী প্রবাহ তাঁর কবিদৃষ্টির উৎসমুখে এসে মিলেছে। সেই প্রবাহের এক শাখা এসেছে অরণ্য-জগৎ থেকে। 'আরণ্যক'-এর আদিম মাটিতে যাদের জীবন-সংগ্রাম, হাসি-কান্না, হিংসা-প্রেমে উত্তাল প্রাণের বিস্ময়কর স্ফূর্তি,—তাদের প্রতিটি চরিত্রকে লেখক আশ্চর্য নৈপুণ্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। মঞ্চী, ভানুমতী, মটুকনাথ, ধাতুরিয়া, যুগল-প্রসাদ—পৃথিবীর সচল প্রাণ-প্রবাহে এরা অবিস্মরণীয় নাম। কিন্তু বিভূতিভূষণের দৃষ্টি কেবল ওই আরণ্যক মানুষের জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। একদিকে সহজ, অনাড়ম্বর পল্লী-মানুষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মমত্ববোধ যেমন ফুটে উঠেছে 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ, হরিহর, সর্বজয়া ও দুর্গার চরিত্রে, অন্যদিকে তেমনি 'অপরাজিত'-'অনুবর্তন' উপন্যাসে অসংখ্য শহর-বাসী নরনারীর জীবন-সংগ্রামের তীব্র যন্ত্রণা ও অসহায় আত্মবঞ্চনার ছবির মধ্যে লেখকের চরিত্র-সৃষ্টির অসাধারণ বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে যাঁরা একরঙা, বৈচিত্র্যহীন ছবিমাত্র ব'লে মনে করেন, তাঁদের একবার মনে মনে উপলব্ধি করতে বলি, অপু বা জিতু চরিত্রের পাশে 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র হাজারী ঠাকুর বা 'অনুবর্তনে'র যদুমাস্টারের চরিত্রকে। কিংবা 'আরণ্যকে'র যে কোন চরিত্রের সঙ্গে হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েল বা আলম মাস্টারের চরিত্রকে। অথবা স্বতন্ত্রভাবে বিচার ক'রে দেখতে বলি, ভানুমতী, মালতী (দৃষ্টি প্রদীপ), লীলা (অপরাজিত), সর্বজয়া, দুর্গা ও পদ্ম-ঝি'র (আদর্শ হিন্দু হোটেল) চরিত্রকে। এতগুলি নরনারী—এরা সবাই কি একই ধরণের চরিত্রের নিছক বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি, না, জীবন-বোধের স্বাতন্ত্র্যে, ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার উষ্ণ স্পর্শে এরা

প্রত্যেকেই এক একটি উজ্জ্বল, সজীব ব্যক্তিত্ব? 'সহৃদয়', সংবেদী পাঠক-মাত্রই সেকথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ: অধ্যাত্ম-ও অতিপ্রাকৃত-চেতনা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা তথাকথিত বাস্তববাদী অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে বাস্তববাদী, তাঁরা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মানবমুখী সুরটিকে তেমন স্পষ্ট করে নাকি অনুভব করতে পারেন না। তাঁর সাহিত্যে নাকি মানবজীবনের দুঃখ-দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের বাস্তব জীবনচিত্র তেমন স্পষ্ট বা তীব্র নয়, সামাজিক নিপীড়ন বা অবক্ষয়ের ছবিটি তেমন জীবন্ত নয়। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাস তাঁর সমসাময়িক বা উত্তরকালের 'বাস্তব' উপন্যাসগুলির মত সুগভীর মানব-চেতনা-সম্পৃক্ত নয়।

এ অভিযোগের জবাব দিতে গেলেই অধ্যাত্ম-প্রেরণার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অন্যান্য আধুনিক উপন্যাসকারের মানব-চেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের মানব-মুখীনতার একটা বড় প্রভেদ এই যে, তাঁর চেতনার একটা বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত আছে। জগৎ ও জীবনের সেই বিশাল দেশ-কাল-অতিশায়ী পটভূমিতে রেখে তিনি মানবমন ও মানবজীবনকে অনুভব করতে চেয়েছেন। আর এই বৃহৎ পটভূমি ও সমগ্র মানবজীবনকে 'সূত্রে মণিগণা ইব' বিধৃত করে কিংবা মৃগকস্তুরীর মত গোপন সৌরভে অমৃতময় করে রেখেছে—সুগভীর এক অধ্যাত্ম-বিশ্বাস। এই চেতনা সবসময়েই খুব স্পষ্ট কোন উপলব্ধিরূপে বা তত্ত্বের আকারে প্রকাশ পায়নি। এটি লেখকের অন্তর্লোকে এমন নিবিড় ও সহজ এক আশ্রয়লাভ করেছে যে তার ফলে তাঁর সমস্ত রচনায় এই গভীর প্রত্যয়ের সুর বা সৌরভ একটি সর্বব্যাপী শক্তি বা Pervading spirit-এর মত সহজ আনন্দে ছড়িয়ে পড়েছে।

দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়নের ছবি তাঁর সাহিত্যে অজস্র। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'অনুবর্তন', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'দৃষ্টিপ্রদীপ'—তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই দুঃখ-বেদনার নিবিড় রসে ভরা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, ওই উপন্যাসগুলি পড়া শেষ হ'লে আমাদের মনে দুঃখ-দারিদ্র্যের গ্লানি বা মালিন্যের বুকফাটা আর্তনাদ আদৌ মুখর হয়ে ওঠে না, বরং এক আশ্চর্য প্রসন্নতায় আমাদের মন ভরে যায়। মানবমহিমার এক বিস্ময়কর দীপ্তিতে আমাদের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এর কারণ কিন্তু জীবন-পলাতক নিরুপায় মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস নয়। মানুষের জীবনে দুঃখ-গ্লানি তুচ্ছতাকে স্বীকার করে নিয়েও লেখক যে তারি মধ্য থেকে মানবজীবনের অন্তর্নিহিত মহিমা ও উজ্জ্বল প্রসন্নতা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাকেই জীবনের নিগূঢ় বাস্তব রূপ বলে উপলব্ধি করেছেন,—লেখকের এই চেতনা জীবন-পলাতকের অসহায় পরমার্থ-তৃষ্ণা নয়, এটি তাঁর সহজাত গভীর অধ্যাত্মবোধ। জীবনের দুঃখ-দৈন্য-মালিন্যের সঙ্গে এই বোধের কোথাও কোন বিরোধ-সংঘাত নেই। বরং এই চেতনার আলোয় জীবনের সকল বাস্তব সমস্যা-সংকট নূতন এক গভীর তাৎপর্য লাভ ক'রে আমাদের জীবন সম্পর্কে সীমিত ধারণাকে বহুদূর প্রসারিত করে দেয়। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে দারিদ্র্য, অভাব-অনশন ও দুঃখ কোন সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দেয়নি। যদিও তাদের অজস্র ছবি তাঁর গল্পে উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখ-দারিদ্র্যের অনুভূতি লেখকের মনে ধীরে ধীরে রসরূপে সঞ্চিত হয়েছে। সেই দুঃখ-নিঃসৃত রসই তাঁর সাহিত্যে অমৃত-আস্বাদ এনে দিয়েছে। মনে রাখতে হবে কিন্তু, এই বিচিত্র রসসৃষ্টির মূলে আছে লেখকেরই এক নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভূতি।

সাধারণভাবে বিভূতিভূষণের শিল্পীমানসের অন্তরালে, তাঁর সৃষ্টিশীল মনের গভীরে একটি সূক্ষ্ম অধ্যাত্মচেতনা সর্বদাই সক্রিয় ছিল, যার অমৃত-রসায়নে জীবনের সমস্ত দুঃখ-দ্বন্দ্ব পরম আস্বাদ্য এক রসবস্তুরূপে তাঁর কাছে প্রতিভাত হ'ত।

কিন্তু শিল্পীমনের এই সূক্ষ্ম চেতনাটি ছাড়াও বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সর্বাতিশায়ী এক অধ্যাত্মশক্তিতে অখণ্ড বিশ্বাসের আরও স্পষ্টতর পরিচয় আছে। অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রভরা এই বিশাল বিশ্বলোক ও বিস্মৃত অতীত থেকে প্রবহমান মহাকালের এই নিত্যচলমান রূপের অন্তরালে যে বিরাট শক্তি অন্তর্লীন আছে, বিভূতিভূষণের উপন্যাসের নায়ক জীবনের মধ্য থেকে তাকে উপলব্ধি করেছে। 'অপরাজিত' গ্রন্থের শেষে অপু নীলশূন্যে উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই শব্দের মধ্যে যে অন্তহীন জীবনের বাণী শুনতে পেয়েছে, 'দৃষ্টিপ্রদীপে' দ্বারবাসিনী যাবার পথে রাত্রে নির্জন মাঠের মধ্যে কিংবা কহলগাঁওয়ের পথে নায়ক জিতুর মনে যে উপলব্ধি এসেছে, সে-ও এক নিগূঢ় অধ্যাত্ম-চেতনা, চলমান মহাকাল আর গতিমুখর মানবজীবনের অন্তরালবর্তী এক পথিক-দেবতার রূপ-সাধনা। 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি-

সৌন্দর্যের দুর্গম রহস্য নায়কের (!) মনে এক লোকোত্তর মিস্টিক সত্তার অনুভূতি সঞ্চার করেছে। 'নায়ক' অরণ্যের গহনরূপে, মেঘে-ছাওয়া অরণ্যের বিশাল ব্যাপ্তিতে, সামান্য বনপুষ্পের সৌন্দর্যে সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার নিবিড় স্পর্শ অনুভব করেছে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এই ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় মিস্টিক রস ও প্যানথিস্ট (Pantheist) দৃষ্টি যেমন এক আশ্চর্য জীবন-রহস্যের আভাস বহন করে এনেছে, অন্যদিকে এরই সগোত্র আরেক চেতনা তাঁর সাহিত্যে নতুন এক দিগন্ত-পথ মুক্ত করে দিয়েছে। সে পথ অতিপ্রাকৃত-চেতনার রহস্য-পথ।

চারপাশের দৃশ্যমান এই বাস্তব লৌকিক জগতের উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের মত এক অলক্ষ্য রহস্যময় অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব আছে, সেই মৃত্যুপারের অলৌকিক জগতের প্রভাব মাঝে মাঝে আমাদের এই প্রতিদিনের চেনা পৃথিবীর জীবনকে রহস্য-চঞ্চল করে তোলে। সেই অলৌকিক অদৃশ্য জগতের উপলব্ধিকেই বলা চলে অতিপ্রাকৃত-চেতনা। বাঙলা সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু অতিপ্রাকৃত-চেতনাকে আশ্রয় করে স্বতন্ত্র কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও রচনা করেন নি। উপন্যাসের মূলকাহিনীর প্রয়োজনেই তিনি অতিপ্রাকৃত উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত উপাদানের যথেষ্ট পরিচয় পেলেও, খাঁটি অতিপ্রাকৃত রসসৃষ্টি তাঁর উপন্যাসে কতখানি সম্ভব হয়েছে, এ' বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অতিপ্রাকৃত অবলম্বন করে সত্যকার সার্থক গল্প প্রথম লেখেন রবীন্দ্রনাথ। 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'নিশীথে', 'মণিহারা' গল্পের নাম এ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করেই আবির্ভূত হলেন বিভূতিভূষণ। তাঁর রচিত তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পটি নিশীথ রাত্রির নির্জন নিসর্গসৌন্দর্যের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত রহস্যের সংমিশ্রণের দিক থেকে একটি সার্থক রচনা। এ'ছাড়া 'হাসি', 'খুঁটিদেবতা' 'প্রত্নতত্ত্ব' গল্পগুলিও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন বাদ দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি ও কাহিনীর রসাস্বাদের দিক থেকে অভিনব ও সুন্দর।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও এই অতিপ্রাকৃত ধর্মের পরিচয় একেবারে দুর্লভ নয়। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে আছে যে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে দুর্গার প্রায়ই মনে হ'ত মা-বাবা-ভাই সকলকে ছেড়ে তা'কে যেন

কোথায় চলে যেতে হবে। সে অনুভব করত, তার জীবনে কী একটা অনিবার্য বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে চলেছে। লেখক দুর্গার কিশোরী মনে বিবাহের ক্ষীণ আশা-স্বপ্নের সঙ্গে মৃত্যুর অস্পষ্ট রহস্য মিশিয়ে এক সূক্ষ্ম অতিলৌকিক রসসৃষ্টি করেছেন।

'আরণ্যকে'র রহস্যমেদুর পটভূমিতেও দেখি, মহিষের দেবতা টাঁড়বাড়ো, রামচন্দ্র আমিন ও আসরফি টিণ্ডেল-এর অলৌকিক কুকুর-দর্শন কাহিনী, গণু মাহাতোর মুখে শোনা উড়ুক্কু সাপ ও জীবন্ত পাথরের গল্প—একদিকে যেমন অতিপ্রাকৃত রসের দ্বারা আরণ্য-প্রকৃতির রহস্যসৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করেছে, অন্যদিকে আরণ্যক মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ সহজাত আদিম মনটিকেও পাঠকের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে।

'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে এই অতিপ্রাকৃত শক্তির আরও স্পষ্ট পরিচয় আছে। ভাবী জীবনের ঘটনা আগে থেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার যে অলৌকিক শক্তি—তা আজ আর কেবল মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস নয়, আমেরিকা য়ুরোপের বহু বিজ্ঞানবিদ্ ও তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি এ নিয়ে রীতিমতো গবেষণা আরম্ভ ক'রেছেন। বিভূতিভূষণ নিজে এই clairvoyance শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর নায়ক জিতুর মধ্যে এই শক্তি আরোপ ক'রে, বাঙলা উপন্যাসের পাঠক সমাজকে এক বিচিত্র চরিত্র উপহার দিয়েছেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু নিয়ে যে একখানি পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ উপন্যাস রচনা করা যেতে পারে, একথা বিভূতিভূষণের আগে বাঙলা সাহিত্যে আর কেউ কখনও ভাবেন নি। 'দেবযান' উপন্যাসের শিল্পমূল্য যাই হ'ক না কেন, এই অভিনব দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য বিভূতিভূষণ নিঃসন্দেহে পাঠকের প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

জন্মান্তরবাদ, আত্মার নিত্যতা বিভূতিভূষণের কাছে নিছক শাস্ত্রনিহিত তত্ত্ববস্তু নয়, তাঁর সাধকদৃষ্টিতে এগুলি ছিল বাস্তবজীবনের মতই প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সত্য। 'দৃষ্টিপ্রদীপে' যার আভাসমাত্র, তাই পূর্ণতর রূপ পেয়েছে 'দেবযানে'—মৃত্যুর পরপারে আত্মিক জগতের এক কল্পকাহিনীতে। সমগ্র উপন্যাসখানি-ই যেন মৃত্যুপারের এক অন্য জগতের ছবি, কাহিনী ও চরিত্রের প্রদর্শনী। সেদিক থেকে এই বিস্ময়কর উপন্যাসের বিচিত্ররস বাঙলাদেশের পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেছে। 'দেবযানের' বিষয়বস্তুকে যদিও লেখক পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেন নি, যদিও গ্রন্থটিকে

খাঁটি জীবনধর্মী উপন্যাস না বলে 'ফ্যানটাসি' (phantasy) জাতীয় রচনা বলাই বোধহয় অধিকতর সঙ্গত হবে, তবু একথাও মনে রাখতে হবে, বিভূতিভূষণের সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে পটভূমি ও বিষয়বস্তুর বিচারে এমন বৈচিত্র্যময় অভিনব রচনা আর দ্বিতীয় নেই।

"ইছামতী"। বিষয়বস্তু ও পরিবেশ রচনার বৈচিত্র্যের দিক থেকে এটি লেখকের আরেকটি স্মরণীয় গ্রন্থ। ইছামতী' অতিপ্রাকৃত বা মৃত্যু-জগতের কাহিনী নয়। এই মর্তধূলিরই জীবনকথা। তবে এ জীবন আধুনিক কালের নয়। অতীত দিনের বাঙলাদেশের গ্রামজীবনের কাহিনী এই 'ইছামতী'। সেই নীলকুঠির কুঠিয়াল সাহেবদের যুগের গল্প। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগের কথা। ইছামতীর তীরে তীরে আজ যেখানে কুঠির মাঠ খাঁ খাঁ করছে, পুরনো নীলকুঠিগুলির ভগ্নাবশেষ কঙ্কালের মতো মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, একদিন সেখানে জনপদ ছিল, জন্মমৃত্যু হাসিকান্না আশা-নিরাশার ঢেউয়ে ঢেউয়ে তখনও সহজ মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনস্রোত বয়ে চলত—সেই বিগতদিনের অনাড়ম্বর চলমান জীবনের ছবি লেখক তুলে ধরেছেন এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে। অতীত দিনের পটভূমিতে এমন বৃহৎ উপন্যাসে বিভূতিভূষণ আর একটিও রচনা করেন নি।

'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' বা 'দৃষ্টিপ্রদীপে'ও জীবনের এই চলমান রূপের পরিচয় আছে, কিন্তু সেখানে তা' মূলতঃ প্রকাশ পেয়েছে একটি বিশেষ ব্যক্তিমনের চেতনায়। তারই জীবনকথা, উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী ওই উপন্যাস-গুলির প্রধান আশ্রয়। কিন্তু 'ইছামতী' উপন্যাস ওই ধরণের কোনও বিশেষ ব্যক্তির জীবনকাহিনী নয়। কোনও ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ থেকেও চলমান জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করেননি লেখক। যদিও ভবানী বাঁড়ুয্যের কাহিনী ও তাঁর চিন্তাধারা এ উপন্যাসের একটি মুখ্য অবলম্বন, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি এই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নেই। তাঁর জীবনের উপলব্ধি এ উপন্যাসের প্রধান ফলশ্রুতি নয়। তিনি এই বৃহৎ চলমান জীবনকাহিনীর একটি খণ্ড উপাদানমাত্র। ইছামতী

ও তার দুই তীরের গ্রামই এ উপন্যাসের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেখানকার জীবন-কথাকেই লেখক চারণ কবির মতো ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective) ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। তার মধ্য দিয়েই এই কাহিনীর বৃহৎ স্বরূপ-মহিমা ফুটে উঠেছে। কোন বিশেষ নায়ক চরিত্রের আত্মগত (subjective) দৃষ্টির সাহায্য গ্রহণ করেন্ নি। এখানেই 'ইছামতী' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

বিভূতিভূষণের রচনায় প্রেমের স্থান অত্যন্ত সীমিত। তাঁর উদাসীন, ভ্রাম্যমান বাউল প্রকৃতি তাঁকে নারীপ্রেমের মাধুর্য ও জটিল মনস্তত্বে আকৃষ্ট হ'তে দেয়নি। তবু জীবনের কাহিনী রচনা করতে বসে জীবনের প্রবলতম বৃত্তিটিকে অস্বীকার করলে চলে না। তাই তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই প্রেমকাহিনী আছে। সংক্ষিপ্ত হ'লেও আছে। সুতরাং অনেক পাঠক যে অভিযোগ করেন, তাঁর উপন্যাস কেবলই একঘেয়ে প্রকৃতি-চিত্র আর গাছ-পালার কাহিনী, একথা সত্য নয়। তাঁর উপন্যাসে প্রেমের চিত্র আছে, এবং তা' সংক্ষিপ্ত হ'লেও মনোরম। হয়ত' তাঁর প্রেমের মধ্যে যৌবনের উত্তাপ তেমন নেই, 'প্যাশনে'র গাঢ় রূপ নেই, হয়ত তার মধ্যে স্নেহ, সেবা, দয়া, করুণা মিশে যৌবন-কামনার দীপ্তিটিকে একেবারে মৃদু, নিরুত্তাপ করে দিয়েছে—তবু একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর প্রেমকাহিনীরও একটা নিজস্ব মহিমা ও মাধুর্য আছে, যা তাঁর কবিস্বরূপের সঙ্গে একান্তভাবে সংগতিপূর্ণ।

'অপরাজিত' উপন্যাসে লীলার সঙ্গে অপুর করুণ-মধুর সূক্ষ্ম দেহাতীত প্রেমের সম্পর্ক, অপর্ণার সঙ্গে দু'দিনের দাম্পত্য-জীবনের প্রেমমাধুর্য, 'আরণ্যকে' ভানুমতীর সঙ্গে নায়কের একটি বিচিত্র মধুর সহজ প্রীতির বন্ধন, প্রেমের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে এগুলির পরিচয় যাই হ'ক না কেন, এদের মধ্য দিয়ে লেখক কি জীবনের সেই অন্তহীন বিস্ময়ভরা মধুর রসেরই উৎস মুখটি উন্মুক্ত করে দেন নি?

মুখ্যতঃ প্রেমকে আশ্রয় করেই বিভূতিভূষণ দু'একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছিলেন। 'দুই বাড়ী', 'বিপিনের সংসার' ও 'অথৈ জল'। শেষ দু'খানি

গ্রন্থ শিল্পবিচারে সার্থক নয়। কিন্তু 'দুই বাড়ী' উপন্যাসে এক গ্রাম্য কিশোর ও একটি কিশোরীর সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের যে মধুর অথচ বেদনাময় ছবি আছে, তা' একটি নিটোল গীতি-কবিতার সুরে আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের নিজস্ব ভঙ্গীতে রচিত প্রেমের গল্প-ও যে কত মধুর ও মনোরম হ'য়ে উঠতে পারে—এই ক্ষুদ্রকায় স্বল্প-পরিচিত উপন্যাসটি তার নিদর্শন।

এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা গেল, তা থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে বিষয়বস্তু ও পরিবেশের দিক থেকে বৈচিত্র্য নিতান্ত কম নয়। উপন্যাস ছাড়াও বিভূতিভূষণ আরও অনেক কিছু রচনা করে গেছেন। বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বের বিচারে তাদের মূল্যও নগণ্য নয়। 'তৃণাংকুর', 'উর্মিমুখর' ও 'স্মৃতির রেখা'-র মত দিনলিপি বা জার্ণাল কিংবা 'হে অরণ্য কথা কও' এবং বিশেষভাবে 'অভিযাত্রিকে'র মত ভ্রমণকথা বাঙলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত বললে অত্যুক্তি হয় না।

বিভূতিভূষণের মন যে কতখানি বৈচিত্র্য-পিপাসু ছিল তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থ থেকে। এটি উপন্যাস নয়, ডায়েরী নয়, ভ্রমণ কাহিনীও নয়। এই বিচিত্র বিশ্ব প্রকৃতির বহু বিস্ময়কর তথ্য সরস ভঙ্গীতে লেখক উপস্থাপিত করেছেন কিশোর-কিশোরীদের জন্য।

জীবন ও জগৎকে তিনি বিচিত্রভাবে আস্বাদ করে গেছেন, তার পরিচয় একদিকে যেমন পেয়েছি তাঁর গল্প উপন্যাসের বিচিত্রবর্ণ আধারে, তেমনি পেয়েছি ডায়েরী, ভ্রমণ-কথা ও 'বিচিত্র জগতে'র মত গ্রন্থের অভিনব এক একটি আঙ্গিকের মধ্যে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য ও শিল্পীমানসের বৈচিত্র্যধর্মের কথা বললাম। যাঁরা তাঁর রচনায় বিষয়বস্তুর কোন বৈচিত্র্যই দেখতে পান না, তাঁরা যে

অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত, এই ছিল আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বিচিত্র চেতনা ও রসের প্রকাশ হয়েছে, বিশ্বজীবনের নানারূপ, হাসি-কান্নার বিচিত্র ছবি তাঁর গল্প, উপন্যাস, ডায়েরী, ভ্রমণ কথায় ধরা দিয়েছে আশ্চর্য সার্থকতায়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই কথাটা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে। সেটি হ'ল, এই সমস্ত বৈচিত্র্যের আড়ালে বিভূতিভূষণের মূল সুরের কথা। চলমান বহুর মধ্যে সেই অচঞ্চল একের সত্যটি।

বিভূতিভূষণের মানসলোক যদি নিরীক্ষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে, সেখানে কেবল এক জীবন-রসিক শিল্পীর বাস নয়, জীবনরহস্য-সন্ধানী, দ্রষ্টা-প্রকৃতির এক সাধক সেখানে সমাসীন। এই সাধক-শিল্পী জীবনের বিচিত্র রূপ-রসকে ভালোবেসেছেন। বিচিত্র আপাত-তুচ্ছ অভিজ্ঞতায় আপন সত্তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তবু তিনি নিছক বৈচিত্র্যবাদী জীবনশিল্পী ন'ন। জীবনের এই বিচিত্র রূপের মধ্য থেকে তিনি এক অরূপ সত্তার অন্বেষণ করেছেন, সেই এক সৌন্দর্য-সত্তায় সমর্পিত-প্রাণ হয়ে তিনি মহাকাল ও মহাবিশ্বের চলমান রূপের মধ্যে একটি গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন।

তাই বলছিলাম, বিভূতিভূষণের শিল্পলোকে বৈচিত্র্যের আস্বাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। বিভিন্ন কাহিনী, বিচিত্র বিষয়বস্তু তাঁর সাহিত্য-ভূমি অন্বেষণ করলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই বৈচিত্র্যধর্ম সাধারণ জীবনশিল্পীর বিষয়-বৈচিত্র্য নয়। একটি মূল রাগিণীর ওপর তিনি বিচিত্র সুরের সূক্ষ্ম বর্ণজাল বিস্তার করেছেন। সূক্ষ্ম সংবেদনশীল পাঠকের চেতনায় কেবল সেই সুর-বৈচিত্র্যের উপলব্ধি বেজে ওঠে। আর ওই একই কারণে সাধারণ গল্প-পিপাসু পাঠকের চোখে বিভূতিভূষণের রচনা বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে বিষয়বস্তুর বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি মাত্র।

॥ শিল্প-প্রকরণ ॥

যিনি কবি কিংবা ঔপন্যাসিক, এককথায় সৃজনধর্মী সাহিত্যিক, তাঁর মন আর শিল্পবস্তুকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। মনের মধ্যে যখন নিগূঢ় অনুভূতি জাগে, শিল্পীর মনে তা' একেবারে নিরবয়ব, 'নিরালম্ব' হয়ে দেখা দেয় না। কোন না কোন ভাবে একটা রূপ নিয়েই তা আসে। শিল্পীর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা-উপলব্ধি, তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব, এই 'রূপ'কে আশ্রয় করেই। সাহিত্য-শিল্পে তাই রূপ বা আঙ্গিক-প্রকরণের এত প্রাধান্য। এ থেকে আজকের দিনে অনেকের ধারণা হয়েছে যে, সাহিত্যে শিল্প-প্রকরণই বুঝি সর্বস্ব। বিষয়বস্তু নেহাৎ গৌণ। আধুনিক কাব্যে, ছোট গল্পে, এমনকি উপন্যাসেও তাই চোখে পড়ে শিল্প-রীতির আতিশয্য, তার বহু বিচিত্র ঐশ্বর্য। বিষয়বস্তু যতই অন্তঃসারশূন্য হ'ক, কেবল চোখধাঁধানো আঙ্গিকের জোরে প্রশংসা পেয়েছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, এমন বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়।

আধুনিক উপন্যাসে এই আঙ্গিক-প্রাধান্যের দিকে চোখ রেখে যাঁরা বিভূতিভূষণের রচনা পড়েন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই এই অভিযোগ, তিনি আধুনিক কালের লেখক, অথচ তাঁর রচনায় আঙ্গিকের নৈপুণ্য ত' তেমন চোখে পড়ে না। বরং অন্যান্য অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও এই আঙ্গিক-দুর্বলতা তাঁর সাফল্যের প্রধান এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক'কে কাব্যধর্মী রচনা হিসেবে মনোরম বলে স্বীকার করেন কুণ্ঠাহীনভাবে, কিন্তু তাদের উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চান না। এর প্রধান কারণ নাকি গ্রন্থ দু'টির আঙ্গিকের শিথিলতা। উপন্যাসের গঠন-রীতিকে লেখক নাকি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি।

এসব বিতর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। তবু দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। আজকের সাহিত্যে আঙ্গিক-প্রাধান্য নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করছেন, তাঁরা গোড়াতেই একটা মস্ত ভুল করে বসে আছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, সাহিত্য রূপময়, প্রকাশধর্মী সামগ্রী বটে, কিন্তু কিসের রূপ, কিসের প্রকাশ? রূপ-প্রসাধনের মত্ততার মধ্যে সে কথাটা অনেকেরই মনে থাকে না। সমগ্র সাহিত্যই হ'ল জীবনের রূপ-শিল্প। জীবনের বিচিত্র প্রকাশ। সুতরাং কোন রচনায় যদি আঙ্গিক জীবনকে, জীবনের উপলব্ধি

ও রসচেতনাকে ডিঙিয়ে নিজেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যেখানে প্রসাধন-কলাটাই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তার আড়ালে রক্ত-মাংসের মানুষটা নগণ্য হয়ে হারিয়ে যায়, সেখানে সার্থক শিল্প-সৃষ্টি হয়েছে একথা বলা আদৌ সংগত হবে কি?

আঙ্গিক-সর্বস্ব অধিকাংশ আধুনিক-সাহিত্যই এই দোষে দুষ্ট। সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলেই শিল্পকৌশলের প্রয়োজন অপরিহার্য। কোন-না-কোন form-এর আধারে হৃদয়ের অনুভূতিকে ভরে দিতে হবে। কিন্তু সেই সাহিত্যই শ্রেষ্ঠতার মর্যাদা পাবে, যেখানে রূপ ও রস, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কোন একটিকে যেখানে বিশেষ করে চোখে পড়ে না। সাহিত্যের তুলাদণ্ডের দু'টি পাল্লা। আঙ্গিক আর বিষয়। দুই দিকেই সমান ওজন, সম্পূর্ণ ভারসাম্য যেখানে, সেখানেই শিল্পীর রসসিদ্ধি। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনায় এই ভারসাম্য রক্ষার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় আছে। শক্তিমান সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁকেই বলা হয়, যাঁর রচনায় 'art lies in concealing art,'। লেখক এমন সুনিপুণভাবে শিল্প সৃষ্টি করবেন, যার মধ্যে লেখকের আঙ্গিক-প্রয়োগের কোন সচেতন প্রয়াসের চিহ্নমাত্র থাকবে না। সমস্ত আড়ম্বর, ঐশ্বর্য, সমস্ত অলংকার ও আঙ্গিক-বাহুল্যকে অন্তরালে রেখে স্রষ্টার শিল্পবস্তুটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে যেন 'আপনাতে আপনি বিকশিত' হয়ে উঠবে।

এসব কথা বহুল-প্রচারিত। অনেকের কাছেই হয়ত নেহাৎ পুরণো, মামুলী ঠেকবে। কিন্তু তবু আরেকবার মনে করিয়ে দিতে হ'ল। কারণ প্রয়োজনের সময় অনেক বহুশ্রুত তথ্য বা তত্ত্ব আমাদের মনে থাকে না। ফলে বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়।

বিভূতিভূষণের শিল্পলোক পরিক্রমা ক'রে এলে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-গুলির দেখা মিলবে। তাঁর 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' কিংবা 'অনুবর্তন' উপন্যাসে বিষয় ও আঙ্গিকের ভারসাম্য আশ্চর্য কৌশলে রক্ষা করা হয়েছে। নিছক নগণ্য বিষয় নিয়ে আঙ্গিকের হাস্যকর আড়ম্বর সৃষ্টি যেমন তিনি করেননি, তেমনি গুরুভার বিষয়কে সৌন্দর্যলেশশূন্য রচনারীতির মাধ্যমে প্রকাশের অপপ্রয়াসও কোথাও চোখে পড়ে না।

'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' বা 'আরণ্যক'-এ লেখকের যে-ধরণের অভিনব জীবনদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, মহৎ জীবনের যে বিস্ময়কর চলমান

রূপের কাহিনী সেখানে আছে—তাদের প্রকাশের বাহন হিসেবে তথাকথিত উপন্যাসের বাঁধাধরা ছক কখনো কার্যকরী হ'তে পারে না। *বিভূতিভূষণ* তাই প্রচলিত আঙ্গিকের পথ অনুসরণ না ক'রে নিজের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক আধার আবিষ্কার করলেন। তাঁর ভাববস্তু-বহনের পক্ষে সেই শিল্পাধারটি-ই সম্পূর্ণ উপযোগী। অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বিভূতিভূষণের কাছে উপন্যাসের এই আঙ্গিক বা বাহন কোন পৃথক সচেতন প্রয়াসের ফল নয়। তা যদি হ'তো, তাহ'লে কখনোই আঙ্গিক ও বিষয়ের সার্থক ও সহজ সংগতি ঘটত না। যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মনে অনুভূতি জন্ম নিয়েছে, তেমনি সহজ প্রবাহের মত কাহিনীর রূপকল্পও তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছে।

পাঠকগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ বিভূতিভূষণের রচনাভঙ্গীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় না পেয়ে তাঁকে শিল্পী হিসেবে অসচেতন (uncons-cious) বা আত্মবিস্মৃত ব'লে গণ্য করেছেন। বিভূতিভূষণের শিল্পীমানস কতখানি সচেতন বা অসচেতন ছিল, সে বিচারের মধ্যে প্রবেশ না করেও এটুকু বলা যেতে পারে যে, prefect novel বলতে আমরা যা' বুঝি, উপন্যাসের সেই নিখুঁত কাঠামো বিভূতিভূষণের রচনায় দেখা যায় না। আঙ্গিকের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে তিনি আত্মবিস্মৃত শিল্পীর মত আপন খেয়ালে সৃষ্টি করে গেছেন, একথা নিশ্চয়ই সত্য নয়। কিন্তু এটুকু সত্য যে, উপন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি তিনি সর্বত্র অনুসরণ করেন নি।

প্রথম কথা, তাঁর উপন্যাসের কাঠামো আদৌ দৃঢ়বদ্ধ নয়। শ্লথবিন্যস্ত। ঘটনাগুলি অনেক সময় অপরিহার্যরূপে আসে নি কিংবা একটি বিশেষ পরিণতি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলে নি। নানা এলোমেলো কাহিনী ও ঘটনা উপন্যাসের মধ্যে এমনভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে, যেগুলি অন্যভাবে সাজানো হলেও হয়ত' খুব ক্ষতি হ'ত না। অর্থাৎ তাদের পারম্পর্য কখনই organic কিংবা অনিবার্য নয়। 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর কলকাতার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অথবা 'আরণ্যক' উপন্যাসের বক্তা-চরিত্রের ইতস্ততঃ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এই মন্তব্য করা চলে।

ঘটনাগুলির এই পারস্পরিক দৃঢ় বন্ধনের অভাব ও বিভূতিভূষণের বর্ণনা-মূলক (narrative) রচনাভঙ্গী তাঁর উপন্যাসগুলিতে একটি ধীরমন্থর গতি সঞ্চার করেছে। লেখকের কাছে স্বতন্ত্র ঘটনাগুলি যেন কতকটা

'চিত্রার্পিতবৎ'। একটির পর একটি ঘটনা তিনি ছবির মত বর্ণনা করে চলেছেন। সে-ভঙ্গীর মধ্যে নাটকীয় উত্তাপ নেই, ঘটনার গতি-চাঞ্চল্য নেই। বিভূতিভূষণ জীবনদৃষ্টিতে যুগযুগান্তব্যাপী চলমান জীবনের শিল্প-সাধক ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাহিনীবিন্যাসের ভঙ্গীর মধ্যে চঞ্চল গতিপ্রাণতা চোখে পড়ে না। সব কিছুই যেন ধীর, মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে এ'এক বিচিত্র paradox!

রচনাভঙ্গীর এই ধীর মন্থরতার জন্য বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নাটকীয় শিল্পরীতি বা নাট্যরসের সমৃদ্ধি নেই। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ও গতি-চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলি রসমধুর হয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের শিল্পবোধ নাটকীয় পদ্ধতিকে আশ্রয় করে নি। তাঁর উদাসীন বাউলমনের দৃষ্টিতে জীবনের দ্বন্দ্ব-জটিল নাটকীয় মুহূর্তগুলি তেমন প্রাধান্য পায় নি। জীবনকে তিনি সহজ সরলরেখার মত দেখেছেন, তাকে রূপ-ও দিয়েছেন জটিলতামুক্ত সরল ভঙ্গীতে।

বিভূতিভূষণের জীবন থেকে জানা যায়, তাঁর পিতা কথকতায় বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। পুত্রের রচনাভঙ্গীর মধ্যেও সেই কথকসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই চোখে পড়ে। সেই সহজ সুরময় সুললিত বর্ণনাশ্রিত ভঙ্গী। প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে যাকে 'স্বভাবোক্তি' বলা হয়েছে, বিভূতি-ভূষণের সমগ্র সাহিত্য সেই একক অনাড়ম্বর অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে আছে।

বিভূতিভূষণের এই শিল্পরীতি যে ত্রুটিহীন, একথা বলিনে। তাঁর রচনার এই শিথিল মন্থর গতিভঙ্গী, তীব্র দ্বন্দ্বের অভাব, কোথাও কোথাও প্রায় একই বিষয় বা অনুভূতির পুনরাবৃত্তি ('পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক'-এ লক্ষণীয়) তাঁর রচনাকে মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর করে তুলেছে। তাঁর সাহিত্যের সে অংশগুলি একটানা সুরঝংকারের মত মধুর, কিন্তু নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন!

অবশ্য এ সমস্ত কথা আলোচনা করার পরেও, একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়। সে প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা আগেই সাধারণভাবে আলোচনা করেছি। কোন লেখকের শিল্পরীতি বিষয়-নিরপেক্ষ নয়। বিষয় ও আঙ্গিক পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। বিভূতিভূষণের শিল্পভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বা ত্রুটি আবিষ্কার করার মুহূর্তে এ বিষয়েও পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে যে, সেই শিল্পভঙ্গী তাঁর রচনার বিষয়বস্তু বা জীবনদৃষ্টির সঙ্গে নিবিড়, অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে সংহত কিনা।

বিভূতিভূষণের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলির স্বরূপ ও রূপকল্প বিচার করলে, পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদিপর্বে প্রচলিত Picaresque novel-এর সঙ্গে তার আংশিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অবশ্য একথা সত্য, খাঁটি 'Picaresque' উপন্যাসের নায়ক ('Picaro') যে-ধরণের স্বেচ্ছাচারী, অপরাধপ্রবণ বাউণ্ডুলে রূপে কল্পিত হতো, বিভূতিভূষণের কোন নায়ক-ই সেধরণের নয়। তবে Picaresque উপন্যাসের মতো তাঁর আখ্যায়িকা-গুলিতে-ও নায়কের ভ্রাম্যমান, ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নানা খণ্ড ছিন্ন চিত্র রূপ পেয়েছে। সেদিক থেকে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ও 'আরণ্যক'কে মোটামুটি একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণের যেমন এক শান্ত, উদাসীন অথচ রোম্যান্টিক বাউলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তাঁর নায়ক চরিত্রগুলির মধ্যেও মূলতঃ সেই একই ধরণের জীবনদৃষ্টি সঞ্চারিত হয়েছিল। তারা উদাসীন পথিক, তারা জীবনে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত চায় না, অকারণ চাঞ্চল্যের প্রত্যাশী তারা নয়। জীবনের ছোট-বড় ঘটনার স্রোতে তারা ক্রমাগত ভেসে চলেছে। এই ধরণের নায়কচরিত্র ও জীবনদৃষ্টি নিয়ে বিভূতিভূষণ যেসব উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন—তাদের রূপকল্প ও রীতি-পদ্ধতি-ও নিশ্চয়ই ওই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হ'বে। হয়েছে-ও তাই। আর সেইখানেই বিভূতিভূষণের শিল্পরীতির মৌলিকতা ও আশ্চর্য সাফল্য।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গঠনরীতির গোষ্ঠী-নির্ণয় করতে গিয়ে অনেকের যেমন Picaresque উপন্যাসের লক্ষণগুলি মনে হ'তে পারে, তেমনি আবার তাঁর উপন্যাসে ডায়েরী ও ভ্রমণ কাহিনী-ধরণের রচনারীতিও দুর্লক্ষ্য নয়। দুর্লক্ষ্য ত' নয়ই, বরং একটু বেশিই চোখে পড়ে। এ কথা কারো অজানা নয় যে, বিভূতিভূষণের জীবনে দেশভ্রমণ ছিল একটা প্রচণ্ড, দুর্নিবার আকর্ষণ। পথ চলার নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসেছিল। তাঁর উদাসীন ভবঘুরে মনের সঙ্গে এই অক্লান্ত পথ-পরিক্রমার একটা নিগূঢ় সংগতি ছিল। তাঁর এই পথিক-জীবনের ইতিহাস তিনি নানা ভ্রমণ-কাহিনী কিংবা ব্যক্তিগত দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। উত্তরকালে উপন্যাস রচনার সময় এগুলি থেকে তিনি নানাভাবে সাহায্য পেয়েছেন। 'অপরাজিত' এবং বিশেষ ক'রে 'আরণ্যক' উপন্যাসে এর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। 'আরণ্যক'-এর বহু পংক্তি, নানা অনুভূতির সঙ্গে 'স্মৃতির রেখা'

নামক ডায়েরীগ্রন্থের বিভিন্ন অংশের সাদৃশ্য, এমন কি ভাষার মিল পর্যন্ত চোখে পড়বে। 'আরণ্যকে'র মধ্যে একটানা কাহিনী নেই। নানা দিনের ভ্রমণের নানা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা সেখানে কিছুটা ডায়েরীর মতো খণ্ড খণ্ড রূপে, কিছুটা ভ্রমণ কাহিনীর ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'অপরাজিত' বা 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র মধ্যেও এই ভ্রমণ-কাহিনীর পরিচিত ভঙ্গী চোখে পড়ে। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুর বিদেশ যাত্রা ও মধ্যপ্রদেশের আরণ্যক-অভিজ্ঞতা উপন্যাসের চেয়ে ভ্রমণ-কাহিনীর রসে বেশি পুষ্ট মনে হয়। সেখানে লেখকের কথনভঙ্গীও যেন ভ্রমণ সাহিত্যের অধিকতর উপযোগী। অবশ্য এহ বাহ্য। শেষ পর্যন্ত কিন্তু শিল্পীর প্রতিভা ও অখণ্ড জীবনদৃষ্টির আগুনের তাপে সমস্ত খণ্ড খণ্ড অংশ মিলেমিশে একাকার হয়ে একটি সামগ্রিক উপন্যাসের রূপ নিয়েছে। বাইরে থেকে, কাহিনীর দিক থেকে বিভূতিভূষণের বেশীর ভাগ উপন্যাসকে ডায়েরী-লক্ষণাক্রান্ত ভ্রমণসাহিত্য ধরণের রচনা মনে হয়। কাহিনীর নিবিড় ঐক্য সেখানে সব সময় মেলে না। কিন্তু সমস্ত আপাত-বিচ্ছিন্নতা ও গ্রন্থি-শিথিলতার তলে তলে একটি ঐক্যবন্ধন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যায়। সে ঐক্য কাহিনীগত নয়, ভাবগত। Unity of Time and Place যদি না-ও থাকে, Unity of Inspiration, যা সব মহৎ উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, সেই একক জীবনবোধের বন্ধনে তাঁর সবক'টি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই সংহতি লাভ করেছে।

Picaresque উপন্যাস, কিংবা ডায়েরী-ধরণের আখ্যায়িকা যা-ই বলি না কেন, এসব সংজ্ঞা দিয়ে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের প্রকৃত পরিচয় যেন দেওয়া যায় না। এ সব যেন তাঁর উপন্যাসের আংশিক, বহিরঙ্গ পরিচয়। কিছুটা Picaresque, কিছুটা ডায়েরী বা ভ্রমণকাহিনীর লক্ষণ হয়ত এসব উপন্যাসে আছে, কিন্তু তবুও যেন মনে হয় তাঁর উপন্যাসকে কেবল এই ক'টি আঙ্গিক বা রূপকল্পের সীমায় বাঁধা যায় না। আরও কিছু বলার থাকে।

চরিতমূলক উপন্যাসের লক্ষণ বিচার ক'রে কেউ কেউ 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' বা 'দৃষ্টিপ্রদীপ'কে ওই গোষ্ঠীভুক্ত করতে চান। তাঁদের যুক্তি একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। অপু বা জিতুর জীবনের ধারাবাহিক কাহিনী, জন্ম বা শৈশব থেকে পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির

ইতিহাস ওই উপন্যাসগুলিতে বিবৃত হয়েছে। এদিক থেকে চরিত উপন্যাসের (Biographical Novel) মূল লক্ষণগুলির সঙ্গে এদের নানা উপাদানের সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু আবার বলি, এহ বাহ্য। বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে যদি কেউ নিছক চরিতউপন্যাস বলে চিহ্নিত করতে চান, তবে তিনি নিজের স্থূল দৃষ্টি ও রসবোধের অভাবেরই পরিচয় দেবেন। কারণ বিভূতিভূষণের কোন উপন্যাসই কেবল একটি ব্যক্তিবিশেষের জীবনকাহিনীই নয়, উপন্যাসের শেষে সেই বিশেষ ব্যক্তিটিরই সাফল্য-ব্যর্থতার উল্লাসে-বেদনায় আমাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না—তা ছাড়াও আরও অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক জীবন-উপলব্ধির আনন্দে পাঠকচিত্ত শান্ত, প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

সে উপলব্ধি মহাকালের। বৃহৎ বিশ্বলোকের। এই Time ও Space-এর সংস্পর্শে তাঁর উপন্যাসগুলি চরিতউপন্যাসের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে আধুনিক 'এপিক' (Epic) উপন্যাসের স্তরে উন্নীত হয়েছে। মহাকাব্যের বৃহৎ বিস্তার ও ব্যঞ্জনা তাঁর উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। অসংখ্য ছোট বড় চরিত্র, নানা খণ্ড খণ্ড ঘটনার সমবায়ে জীবনের বৃহৎ রূপ সেখানে ফুটে উঠেছে। তবে এপিক-উপন্যাসে সাধারণতঃ বাস্তব ও concrete ঘটনার যে বিপুল সমাবেশ থাকে, ঘাতপ্রতিঘাত-ক্ষুব্ধ মানবজীবনের যে-নাটকীয় রস সেখানে সঞ্চারিত হয় (তুলনীয়: 'War and Peace', 'Jean Christophe' কিংবা 'Brothers Karamazov'), বিভূতিভূষণের উপন্যাসে তা' তেমনভাবে নেই, সেকথা আগেই বলেছি। তাঁর উপন্যাসে 'এপিক্'-প্রসারের সঙ্গে 'লিরিক'-সৌকুমার্য ও সুর-স্নিগ্ধতা মিলে গিয়ে একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাতহীন, সহজ, উদার জীবন-পরিবেশ রচনা করেছে।

'এপিক্'-উপন্যাস বলতে প্রচলিত অর্থে আমরা যা বুঝি, তা'ই আধুনিক সমালোচকদের দৃষ্টিতে আরও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে। ইংরেজ সমালোচক Edwin Muir তাঁর 'The structure of the novel' গ্রন্থে যে 'Chronicle'-এর পরিচয় ও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, তা' 'এপিক্'-উপন্যাসেরই প্রায় নামান্তর। মুইর বলেছেন 'Chronicle' শ্রেণীর উপন্যাসের প্রধান কথা কাল-চেতনা। এ কাল বা সময়, কাহিনী বা চরিত্রের মধ্যে সব সময় অন্তর্লীন থাকে না, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবনের ছোট খাটো ঘটনা বা উত্থান-পতনের সঙ্গে এর অনিবার্য যোগ নেই (: 'It is not

seized subjectively and humanly in the minds of the characters')। এ কাল যুগযুগান্তব্যাপী প্রবহমান মহাকাল। এই বিপুল পৃথিবীর ওপর দিয়ে এই নিরবধি কালের আদি-অন্তহীন প্রবাহ চলেছে (: "In the chronicle, time is external ;......it is seen from a fixed Newtonian point outside. It flows past the beholder ; it flows over and through the figures he evokes")। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার কাহিনী যেখানে শেষ হয়ে যায়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। আবার, একটি মাত্র ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাল বিশ্বের জীবনস্রোত স্তব্ধ হয়ে যায় না। তা সব কিছু ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে বয়ে চলে সামনের দিকে। ('পথের পাঁচালী'র শেষ অনুচ্ছেদ স্মরণীয়) Chronicle-এর বিচিত্র, আপাত-বিচ্ছিন্ন কাহিনীর ভিতর দিয়ে মহাশিল্পীর এই মহৎ জীবনবোধ আমাদের মর্মমূলকে স্পর্শ করে।

বিভূতিভূষণের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে এই Chronicle-এর সহজ সংগতি আছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির কুল-বিচার করতে গিয়ে Picaresque, ডায়েরীধর্মী, ভ্রমণমূলক, কিংবা চরিতাশ্রয়ী—নানা স্তরের উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ সেখানে পেয়েছি। একথা অস্বীকার করতে পারিনে। উপন্যাস জীবনধর্মী সজীব সৃষ্টি। তাই তাকে কোন একটি মাত্র সংজ্ঞার সীমায় বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়, বোধ করি উচিত-ও নয়। প্রত্যেক শিল্পীর মনে তাঁর নিজস্ব রূপকল্প স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝরের মত জেগে ওঠে। নানা পরিচিত, প্রচলিত আঙ্গিকের নানা অংশের সমবায়ে তার আপন স্বতন্ত্র রূপটি গড়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে-ও তাই হয়েছে। তবে সমস্ত দিক বিচার করে এটুকু বলা যেতে পারে যে 'লিরিক'ধর্মী Chronicle-এর সঙ্গেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অপেক্ষাকৃত নিবিড় সান্নিধ্য। অন্তরঙ্গ যোগ।

বিভূতিভূষণ ধরা-বাঁধা আঙ্গিকের রীতি মেনে সাহিত্য সৃষ্টি করেননি বলেই একদিকে বাঙলা উপন্যাসে যেমন নূতন গঠন-শিল্পরীতির প্রবর্তন করে যেতে পেরেছেন, তেমনি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে-ও তাঁর আঙ্গিক ও শিল্পপদ্ধতির

মৌলিকতা নূতন ধারার জন্ম দিয়েছে। ছোটগল্পের পূর্ব-আচরিত ভঙ্গী ত্যাগ ক'রে বিভূতিভূষণ নূতন রীতির প্রবর্তন করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে কাহিনীভাগ সামান্য, চমকপ্রদ ঘাতপ্রতিঘাত-বহুল ঘটনা বা চরিত্র সেখানে একরকম অনুপস্থিত বলা চলে। এমনকি গল্পের শেষে সাধারণতঃ যে 'surprise' দেবার রীতি আছে, বিভূতিভূষণের নিতান্ত সরল সাদামাটা কাহিনীতে তারও একান্ত অভাব। গল্পগুলির আবেদন সাধারণ কাহিনী-পিপাসু পাঠকের কাছে অনেক সময় তাই ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য একটা গ্রাম্য ঘটনা কি স্মৃতিকথা কিংবা একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু—এই নিয়ে সহজ শাদা ভাষায় কয়েক পৃষ্ঠার কাহিনী। সে কাহিনীতে গল্পের চেয়ে সুরময় আবেদনটিই অধিকতর মর্মস্পর্শী। তার সমাপ্তি-ও ওই সূক্ষ্ম গীতিমূর্ছনার সুরে। তাঁর গল্পগুলি যেন বাউলের একতারার মেঠো সুরে বাঁধা। আপাত-বৈচিত্র্যহীন, চমকবর্জিত, আঙ্গিকের রূপসজ্জা-বিরহিত এই গল্পগুলি অনেকের চোখে 'স্কেচ' (Sketch) জাতীয় রচনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ 'স্কেচে'র মধ্যে যে বর্ণসম্পদহীন অসম্পূর্ণ ভাঙাচোরা একটা রূপ থাকে, এগুলি আদৌ সে ধরণের নয়। এদের কাহিনী-অংশ ক্ষীণ হতে পারে, কিন্তু সুরসমৃদ্ধ বাস্তব অনুভবের যাদুস্পর্শে এগুলি জীবনের এক একটি নিটোল স্বয়ংপূর্ণ রসমধুর সত্যকে আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত করে দেয় না কি ? সব মিলিয়ে, বিভূতিভূষণ ছোটগল্পে-ও আঙ্গিক ও শিল্প-বোধের এক দুঃসাহসিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে মৌলিক ধারার সূচনা করে গেছেন।

এরপর ভাষা। বিভূতিভূষণের ভাষা-রীতি সম্পর্কে সামান্য দু'একটি কথা বলে এ' প্রসঙ্গ শেষ করব। উপন্যাস ও গল্পের গঠনরীতিতে যেমন, ভাষার ব্যাপারেও বিভূতিভূষণ তেমনি সহজ, স্বচ্ছন্দ ও অনাড়ম্বর। ভাবের সঙ্গে ভাষার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। বিভূতিভূষণের চিন্তা ও অনুভূতি যেমন সহজ অকৃত্রিম অথচ সুগভীর, তাঁর ভাষা-ও তেমনি একান্ত সরল হয়েও গভীর ব্যঞ্জনায় মর্মস্পর্শী। একথা মোটামুটিভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস

'পথের পাঁচালী' থেকে সুরু করে সমস্ত লেখা সম্পর্কে সত্য। তবে তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় কোথাও কোথাও ভাষা তবু ঈষৎ তৎসম শব্দ-সমৃদ্ধ মনে হয়, হয়ত তাকে বঙ্কিমীপ্রভাব বলে ব্যাখ্যা করাও চলে, কিন্তু উত্তর-কালের রচনায় ক্রমশঃ সে ভারটুকুও দূর হয়ে গিয়েছে। ভাষা একেবারে নিরলংকার ভারহীন মুখের ভাষায় পরিণত হয়েছে। এদিক থেকে বিভূতিভূষণের সঙ্গে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। পরিণত বয়সে এঁরা কেউই সাহিত্যের জন্য আলাদা কোন কৃত্রিম, সাজানো ভাষাকে স্বীকার করেন নি। খাঁটি মুখের ভাষাকেই প্রতিভার যাদুপ্রভাবে রসমধুর ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন।

একটা কথা কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। বিভূতিভূষণের ভাষা যতই সহজ স্বচ্ছন্দ ও নিরলংকার হ'ক না কেন, এ' ভাষা অনুকরণ করা কিন্তু সহজসাধ্য নয়। তার কারণ এ ভাষা ত' শুধু শব্দসমষ্টি নয়, নিজের চিন্তা উপলব্ধি ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে এ ভাষা লেখকের ব্যক্তিমনের বিশেষ এক বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেই বলা হয় 'স্টাইল' (style)। একেই সমালোচকরা বলেছেন, 'personal idiosyncrasy of expression। একে ব্যক্তি থেকে পৃথক্ করে নেওয়া যায় না। 'স্টাইল' মানেই সেই মানুষটির সমগ্র ব্যক্তিত্ব। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমানসেরও এমনি একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যে সেই মানস-বাহন যে-ভাষা, যে রচনা-শৈলী, তা-ও আপাত-দৃষ্টিতে অতি-সাধারণ মনে হলেও, আসলে অনন্যসাধারণ অননুকরণীয়।

নানাদিক্ থেকে, নানা সংজ্ঞার তীক্ষ্ণ আলোয় বিভূতিভূষণের সাহিত্যের শিল্পপ্রকরণ ও ভাষারীতি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই সমস্ত বিচার ও আলোচনার প্রয়োজন নেই একথা কখনও বলিনে। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলব যে, অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিকের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের যে অবকাশ বা যতখানি প্রয়োজন আছে, বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে ততটা নেই। তার কারণ, যাঁরা জাত-ঔপন্যাসিক, সচেতনভাবে সার্থক উপন্যাস লেখার সংকল্প নিয়ে যাঁরা রচনায় ব্রতী হ'ন, বিভূতিভূষণ ঠিক

অপরাজিত ॥

'পথের পাঁচালী'র তিন বছর পরে বেরুলো 'অপরাজিত'। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। গোড়ায় 'অপরাজিত' দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ওই দু'খণ্ড যুক্ত হয়ে একটি গ্রন্থের রূপ নেয়।

একটি পৃথক নামে চিহ্নিত হলেও 'অপরাজিত' আসলে 'পথের পাঁচালী'রই উত্তর পর্ব। শেষ অধ্যায়। নিশ্চিন্দিপুরের নিসর্গলালিত শান্ত নির্জন শৈশব অতিক্রম ক'রে কিশোর অপু এল কাশী। এখান থেকেই সুরু হ'ল তার জীবন-সংগ্রাম। জীবনের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে পেয়ে সে জীবনের প্রকৃত মূল্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল। কাশী-কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে 'পথের পাঁচালী'র অক্রুর-সংবাদ পর্বে। পিতা হরিহরের মৃত্যু ও সর্বজয়া-অপুর নিরাশ্রয় অসহায় অবস্থার বর্ণনার মধ্যেই 'পথের পাঁচালী'র কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু অপুর কাহিনী সেখানেই শেষ হয়নি। সেই অসমাপ্ত কাহিনীর সূত্র প্রসারিত হয়েছে 'অপরাজিত' গ্রন্থে। অপু-র কৈশোর, যৌবন ও প্রাক্তযৌবনের কাহিনী নিয়েই 'অপরাজিত'-র কথাবস্তু গড়ে উঠেছে। নিশ্চিন্দিপুরের কাহিনী যদি অপু-র স্বপ্নমধুর বৃন্দাবন লীলার কাহিনী হয়, তবে 'অপরাজিত'-র ইতিকথাকে তার জীবনের মাথুর-পর্বের উপাখ্যান বলা যেতে পারে। কিন্তু মাথুর-পর্ব ত' স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন স্বতন্ত্র কাহিনী নয়। বৃন্দাবন লীলার পরিপ্রেক্ষিতেই তার রস-পরিণাম। তাই 'অপরাজিত'-র কাহিনী ও রস পূর্ণভাবে উপভোগ করতে গেলে, 'পথের পাঁচালী'কে জানতে হবে, সেই পাঁচালী গানের রসপুষ্ট স্বপ্নমুগ্ধ অপু-কে জানতে হবে। তা না হ'লে কলকাতা শহরের উত্তরঙ্গ জীবনের মধ্যেও যে মানুষটি নির্লিপ্ত, নির্জন—তার পূর্ণ সত্য পরিচয় পাব না। তাকে আকস্মিক অবাস্তব খাপছাড়া এক জীব বলে বোধ হ'বে। তার আচার আচরণ কার্যকলাপ চিন্তা-উপলব্ধির পিছনে পল্লীবাঙলার যে সহজ অকৃত্রিম এক জীবন-পট আছে, প্রকৃতির গভীর রূপলোকের স্মৃতি আছে, সংস্কার আছে, অপরাজিত পাঠকের সেই বোধটুকু থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেই মানসিক প্রস্তুতিটুকু

অপরিহার্য। তাই 'অপরাজিত'-র সঙ্গে 'পথের পাঁচালী' অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত। 'অপরাজিত'-র মধ্যে এই গ্রন্থের নিজস্ব খণ্ডসৌন্দর্য অজস্র ছড়িয়ে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সামগ্রিক সৌন্দর্য বিচারের ক্ষেত্রে 'পথের পাঁচালী'র প্রয়োজন কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

'অপরাজিত' গ্রন্থের অন্যান্য দোষগুণের আলোচনার আগে একটি গুণের উল্লেখ করি। সেটি এর কাহিনী-রস। 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'আরণ্যক'-এর শিল্পসৃষ্টি হিসেবে যত বৈশিষ্ট্যই থাক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে বই দুখানিতে একটানা মধুর কোন কাহিনী নেই। গ্রন্থ দুখানি যেন খণ্ড খণ্ড কাহিনীর সমষ্টি। আর সে আখ্যানগুলিরও অনেক সময় কোন অনিবার্য কালগত পারম্পর্য নেই। অপুর যাত্রা দেখা ও বাবার সঙ্গে আমডোব গ্রামে শিষ্যবাড়ী যাওয়া—এদের যে কোনটি অন্যটির আগে বা পরে ঘ'টলে গ্রন্থের কাহিনীগত বা শিল্পগত কোন মারাত্মক ত্রুটি হতো না। কিংবা 'আরণ্যকে' রাজু পাঁড়ে, মটুকনাথ, কিংবা গণুমাহাতো—নায়কের (!) সঙ্গে এদের কোন একজনের সাক্ষাৎ অন্যের আগে বা পরে হলে (অর্থাৎ গ্রন্থে যেভাবে বর্ণিত আছে, তার অন্যথা হ'লে) উপন্যাসের মৌলিক কোন ক্ষতি হতো না। ঐ থেকে এই গ্রন্থগুলির একটানা কাহিনীর অভাবই সূচিত হয়। কিন্তু 'অপরাজিত' এই ত্রুটি থেকে অনেক পরিমাণে মুক্ত। এই উপন্যাসের কাহিনী অনেক স্থানে শিথিল হ'লেও একটা একটানা গল্প আছে। কাশীতে ধনী জমিদার বাড়ীতে বিধবা মায়ের রাঁধুনীর কাজ নেওয়া থেকে সুরু করে অপুর জীবনের ক্রমবর্ধমান বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিহাস এ কাহিনীতে বিন্যস্ত হয়েছে। চরম দারিদ্র্য অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে অপু বড় হয়েছে, কিন্তু তবু তার চোখ থেকে মহত্তর জীবনের আলো মুছে যায়নি। সে গ্রাম্য অশিক্ষিত কুলপুরোহিত হয়ে জীবন শেষ করতে চায়নি। জ্ঞানের পিপাসা তার মধ্যে ক্রমশঃ তীব্রতর হয়েছে। সেই পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য সে মফঃস্বল শহরের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সেখান থেকে এসেছে কলকাতা শহরে। কলেজে। নিশ্চিন্দিপুরের সেই শান্ত স্বপ্নমুগ্ধ নির্জন স্বভাবের কিশোর কলকাতা শহরের এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্য থেকে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও গভীর উপলব্ধি লাভ করেছে। তারপর মায়ের মৃত্যু, চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ। অপুর বি. এ, পরীক্ষা দেওয়া আর হয়ে উঠ্‌ল না। হঠাৎ সেই সহায়সম্বলহীন, ভবঘুরে, জীবনে অপ্রত্যাশিত

আনন্দের মত এল অপর্ণা। অপর্ণাকে আশ্রয় করে অপুর জীবনে এল এক বিচিত্র-মধুর শান্ত উপলব্ধি। তারপর অপর্ণার আকস্মিক মৃত্যুতে অপু আবার স্বর্গভ্রষ্ট হ'ল। আবার সেই নিরুদ্দেশ পথ। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, দূর মধ্যপ্রদেশের নির্জন অরণ্যে এলোমেলো ঘুরে ঘুরে বিভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতে চাইল অপু। জীবনের তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন কোলাহলের মধ্যে সেই চিরন্তন মহৎ সত্যকে জানতে চাইল গভীরভাবে।

সারা জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তাকে কবি করে তুলল। জীবনের কাহিনীকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ক'রে চলল সে। তারপর একদিন খ্যাতি প্রতিপত্তি এল তার লেখক-জীবনে। বহুদূরে সমুদ্র-মেখলা ফিজি দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার সুযোগ পেল অপু। সে স্থির করল, সে যাবে। পথের আহ্বানে আবার সে চঞ্চল হয়ে উঠল। শুধু একটি কর্তব্য আছে তার জীবনে। তার একমাত্র সন্তান কাজলকে মানুষ ক'রে তোলা। সেই হতভাগ্য মাতৃহারা শিশুকে সে শ্বশুর বাড়ীর নির্মম পরিবেশ থেকে নিয়ে এল প্রথমে কলকাতায়, পরে নিশ্চিন্দিপুর। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে নিশ্চিন্দিপুরের সেই শিশু আবার ফিরে এল তার সেই পুরনো রূপকথার জগতে। সেই আকাশ-মাটি-নদীর স্বপ্নমুগ্ধ স্মৃতিবিহ্বল পরিবেশে। কাজলকেও অপু এই সহজ সৌন্দর্যের পটভূমিতে মানুষ করতে চাইল। সে ভার সে দিয়ে গেল তার বাল্যসঙ্গিনী রাণুদির উপর। আর নিশ্চিন্দিপুরের সোনাডাঙ্গার মাঠ, পদ্মভরা মধুখালির বিল, বেত্রবতী নদী আর পথের দেবতার ওপর। মোটামুটি এই হ'ল 'অপরাজিত'-র কথাসার। ইচ্ছা করেই এখানে এই সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করলাম। এ' থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যাবে যে 'অপরাজিত'-য় একটি ধারাবাহিক কাহিনী আছে। আর সে কাহিনী মধুর মনোরম। আর, ঠিক সেই কারণেই, 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত'-র চেয়ে অন্য অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের কাছে 'অপরাজিত' অনেক বেশী সুখপাঠ্য। কারণ সাধারণ পাঠক সকলের আগে চায়—একটানা একটা সহজ গল্প। বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত'-য় পাঠকবর্গের সে প্রত্যাশা পূরণ করেছেন।

'পথের পাঁচালী' তিন পর্বে বিভক্ত। 'অপরাজিত'-য় সে ধরণের কোন পর্ব-বিভাগ নেই। তবে কাহিনী-বিন্যাসের দিক থেকে এ'কেও তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্ব: এক থেকে চার পরিচ্ছেদ—গোড়া

থেকে অপুর কলকাতা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব : পাঁচ থেকে আঠারো পরিচ্ছেদ—মধ্যপ্রদেশের আরণ্য জীবনের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত। তৃতীয় ও শেষ পর্ব : উনিশ পরিচ্ছেদ থেকে শেষ। শেষ পর্ব প্রধানতঃ অপু ও কাজলের কাহিনী। এই উপন্যাসের প্রধান পটভূমি জনমুখরিত কলকাতা শহর। বিভূতি-ভূষণের 'উদাসীন নির্জন কবিমানসের পক্ষে 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যকে'র শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল। তাঁর জীবনদৃষ্টি ও উপলব্ধিকে সার্থক রূপ দিতে হলে ওই ধরণের পটভূমিরই একান্ত প্রয়োজন। শহরের তরঙ্গক্ষুব্ধ জীবনের মধ্য দিয়ে এক নির্লিপ্ত নির্জন মনের সুগভীর উপলব্ধিকে পরিস্ফুট করা অত্যন্ত দুরূহ শিল্পকর্ম। বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত' গ্রন্থে সেই সুকঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এই দিক থেকে 'অপরাজিত' এক বিচিত্র অভিনব উপন্যাস। 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যকে'র চেয়ে তার মৌলিকতাও সামান্য নয়। তবে এই পরীক্ষায় যে তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন, একথা বলা চলে না। এ'গ্রন্থে বিভূতিভূষণের প্রতিভার চরম সাফল্যের নিদর্শন যেমন আছে, তেমনি ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর প্রতিভার কয়েকটি মৌলিক ত্রুটিও আমাদের দৃষ্টিকে কিছুটা পীড়িত করে। এ সত্য অস্বীকার করা উচিত নয়। 'অপরাজিত'—'পথের পাঁচালী'র শেষ অধ্যায় বা 'উত্তর মেঘ' হলেও দু'টি গ্রন্থের মধ্যে একটি মূলগত প্রভেদ আছে। 'পথের পাঁচালী' অপুর শৈশব ও প্রথম কৈশোরের কাহিনী। নিশ্চিন্দি-পুরের নির্জন নিসর্গ-পট সেই শিশুর লীলা-প্রাঙ্গন। বৈষ্ণবীয় ভাবতন্ময় ও আত্মসমর্পণের অনুভূতি এই কাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম নয়, জীবনকে সহজদৃষ্টিতে স্বীকার করে নেওয়ার সুর বেজে উঠেছে 'পথের পাঁচালী'তে। এক কিশোর-মন দিয়ে দেখা সজীব কিশোর গ্রাম-বাঙ্‌লার ছবি ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। 'পথের পাঁচালী'র পটভূমি ও ভাববস্তুর সঙ্গে এই উপন্যাসের পিছনে স্রষ্টার গীতিপ্রবণ উদাসীন সহজ বৈষ্ণবীয় প্রাণটি অত্যন্ত সার্থক সঙ্গতি লাভ করেছে।

কিন্তু 'অপরাজিত'-য় এই সঙ্গতির অভাব চোখে পড়ে। সেখানে পটভূমির পরিবর্তন হয়েছে। নিশ্চিন্দিপুরের সেই নিশ্চিন্ত অবসর আর নেই। জীবনের দাবী ক্রমশঃ তীব্রতর হয়েছে, নাগরিক পরিবেশের কোলাহলের মধ্যে এসে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে অপু। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'তে চেয়েছে।

পটভূমি ও কাহিনীর মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছে বটে। কিন্তু এর ফলে অপু চরিত্রে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন আসেনি। অবশ্য এ-কথা সত্য যে 'অপরাজিত'র অপুর চোখে, নিশ্চিন্দিপুরের অপুর মত অত গভীর স্বপ্নদৃষ্টি নেই, অতখানি বিহ্বলতা নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সেটুকু গৌণ।

'অপরাজিত'-র অপু বয়সের দিক থেকে উত্তীর্ণ-কৈশোর তরুণ, এমন কি শেষ পর্যন্ত তার প্রৌঢ় (!) কালের কাহিনীরও সামান্য কিছু পরিচয় আছে। কিন্তু লেখকের চোখে অপু প্রায় আগের মতই ভাবাতুর মুগ্ধপ্রাণ চির কিশোরই রয়ে গেছে। 'অপু'—এই নামেই লেখক তাকে সারা উপন্যাসে চিহ্নিত করেছেন। তার পরিণত বয়সেও। মনে হয় যেন, বিভূতিভূষণের চোখে অপুর বয়স বাড়েনি, কিন্তু অভিজ্ঞতা বেড়েছে। দার্শনিক উপলব্ধির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ এক বিচিত্র পরিস্থিতি।

এমন বিসদৃশ অবস্থা সৃষ্টি হবার কারণ, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী। যে মন নিয়ে তিনি 'পথের পাঁচালী' লিখেছেন, সেই একই মন নিয়ে 'অপরাজিত' সৃষ্টি করা চলে না। অথচ লেখক তাই করেছেন। সেই কিশোর মন, সেই ভাবতন্ময় দৃষ্টি, বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের প্রতি উদাসীন মনোভাব 'অপরাজিত'-র পটভূমি ও কাহিনীর সঙ্গে ঠিক সঙ্গতি লাভ করেনি। 'অপরাজিত'র জীবনের দুঃখ-আঘাতের ছবি কম নেই, কিন্তু তাদের রঙের যেন গাঢ়তা নেই, তীব্রতা নেই, সমস্ত দুঃখ-দুর্গতি যেন অপুর স্বপ্নদৃষ্টির প্রভাবে মুহূর্তের মধ্যে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ক্ষীণ বায়ুস্তরে মিলিয়ে গেছে। এবং সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি মধুর ভাবরসের সৃষ্টি হয়েছে।

আসলে এটি কোন ত্রুটি নয়। এ বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গীরই আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যে কাহিনীতে অপু প্রাপ্তবয়স্ক পূর্ণ যুবক, জনমুখর এক বিশাল শহরের নাগরিক, সে কাহিনীতে আমরা অপুর তথাকথিত বাস্তব-জীবন-সংগ্রাম প্রত্যাশা না করতে পারি (কারণ সেটি 'অপরাজিত'-র মুখ্য সুর বা ভাববস্তু নয়), কিন্তু অপুর জীবন পিপাসার আর একটি তীব্রতর পরিচয় পাওয়ার আশা রাখি, তার সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মনের উপর রূঢ় বাস্তবজীবনের প্রতিক্রিয়া ও তার ফলে সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের আরও বিশদ চিত্র প্রত্যাশা করি।

কিন্তু আমাদের সে আশা পূরণ হ'ল না। অপুর অতিরিক্ত উদাসীন, ভবঘুরে ও শিশু-স্বভাবের ফলে জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথাও যেন দৃঢ় নয়। জীবনকে সে দেখেছে, অনুভব করেছে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত জীবনের চলমান বিশাল রূপের অন্তর্নিহিত রহস্যময় আধ্যাত্মিক স্বরূপ সম্পর্কে তার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে। কিন্তু দুঃখের কথা, আমাদের এই রক্তমাংসের একান্ত সজীব, কামনায়-পিপাসায়-গড়া অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি সে কোনদিন নিগূঢ় আকর্ষণ অনুভব করেনি। যৌবনের মধ্যে যে স্বাভাবিক তীব্র গাঢ় জীবন-তৃষ্ণা আছে, তা' অপুকে কোনদিন বিহ্বল অভিভূত করেনি। সেই তৃষ্ণার দৃষ্টি দিয়ে সে জীবনকে কোনদিন নিবিড় ভাবে আলিঙ্গনও করতে চায় নি। তার মেসের জীবন, দারিদ্র্যের জন্য তার দুঃখ, অপর্ণার সঙ্গে তার বিবাহিত জীবন, অপর্ণার মৃত্যুর ফলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া—জীবনের এই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে গেছে বটে, কিন্তু এগুলি তার জীবনের মর্মমূলকে কোথাও যেন নাড়া দিয়ে যেতে পারেনি, তার জীবনকে কোনও গাঢ় রক্তরাগে চিহ্নিত করে যেতে পারেনি। সবই যেন তার দ্রষ্টা মনের কাছে চলমান ঘটনার প্রবাহ মাত্র। অপু-র এই মানস বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় যেন প্রত্যক্ষ জীবনের চেয়ে মহত্তর জীবন, বাস্তবের চেয়ে স্মৃতিলোক এবং মানব সংসারের চেয়ে নির্জন প্রকৃতির প্রতি তার আকর্ষণ অধিক, এদের মধ্যেই সে যেন বেশী স্বস্তি ও সহজ আনন্দ বোধ করে।

কিন্তু 'অপরাজিত'র অপু চরিত্রের পক্ষে এগুলির মাত্রাধিক্য ত্রুটি বলে গণ্য করতে হ'বে। আর শুধু তাই নয়, এর ফলে 'অপরাজিত' উপন্যাসের শেষে অপুর যে 'Becoming'-এর চেতনা, যে মহৎ জীবন উপলব্ধি, তা নিঃসন্দেহে গভীর ও বিস্ময়কর, কিন্তু মনে হয় যেন ওই কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী অনুচিন্তা স্বতন্ত্রভাবেই সুন্দর ও মহৎ, সমস্ত উপন্যাসের কাহিনীতে যেন ওর পূর্ণ বাস্তব প্রস্তুতির ছবি নেই।

জীবনকে তার সমগ্রতায় উপলব্ধি করতে হলে, তার দুটি নিবিড় পরিচয় পেতে হবে। একটি তার স্বপ্ন ও আদর্শ-চেতনার দিক, অন্যটি তার শক্তির দিক, জীবনপিপাসার তীব্রতা ও বিক্ষোভের দিক। এই দুই রূপের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবনের নাট্যলীলা অপূর্ব মহিমা লাভ করে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে জীবনের প্রথমোক্ত রূপের অসামান্য পরিচয়

আছে, কিন্তু শেষোক্ত রূপের ধ্যানে লেখক আত্মমগ্ন হতে পারেন নি। তার ফলে জীবনের বিচিত্র ঘটনার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গচূড়ায় অপুর জীবনের মহিমান্বিত রূপটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তার মহিমময় আত্মার পরিচয় অবশ্য আমরা পেয়েছি, কিন্তু সে সজীব পৃথিবীর অন্তরালে, নির্জনে, ভাবতন্ময় জগতে।

অপুর জীবনকাহিনী অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় তার জীবনে ঘটনা (action) কম, অনুভূতি ও চিন্তা (contemplation) বেশী। এই ধরণের চরিত্র সাধারণতঃ মর্বিড (morbid) হয়ে পড়ে। কিন্তু অপু morbid বা রুগ্নমনা নয়। এমন কি, হ্যামলেটের মত তার মনে অস্থিরতাও নেই। সে আশ্চর্য রকম সুস্থ সহজ চরিত্র। এর কারণ, অপু জীবনে একটি 'প্রত্যয়' (faith) নিয়ে চলেছিল। সে প্রত্যয় মহত্তর জীবনবোধের প্রতি। শেষ পর্যন্ত সেটি স্পষ্ট গভীর এক অধ্যাত্মিক রূপ নেয়। এর ফলে জীবনকে সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। যে কোন বস্তু দেখে আনন্দ পাবার, বিস্মিত হ'বার আশ্চর্য ক্ষমতা তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সহজ সুস্থ দৃষ্টিই তাকে সমস্ত মানসিক অস্থিরতা ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছিল।

অপুর জীবনে জীবন-পিপাসার আংশিক ছবি ফুটিয়ে তোলার অবকাশ ছিল লীলা-উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে। প্রথম কৈশোরের স্বপ্নালোকে অপুর চোখে লীলার যে স্নিগ্ধ মধুর ছবি জেগেছিল, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু উত্তরকালে সেই ছবি যেন আর পরিস্ফুট হলনা, ক্রমশঃ স্তিমিত বিবর্ণ হয়ে এল। অথচ অপর্ণার মৃত্যুর পর লীলা-উপাখ্যানের মর্যাদাও গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। অপুর সেই বিহ্বল বিভ্রান্ত জীবনে লীলার একটি অসাধারণ ভূমিকা থাকার শিল্প-সম্ভাবনা ছিল। তাকে অবলম্বন ক'রে তার জীবন-রহস্য-চেতনার এক নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হ'তে পারত।

কিন্তু তা হ'ল না। লীলা চরিত্র অপরিণত অস্ফুট রয়ে গেল। আর সেই অপরিস্ফুট অবস্থাতেই তার জীবনের এক অতিনাটকীয় (melodramatic) অস্বাভাবিক অবসান হ'ল।

এ সব সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য, বাঙলাসাহিত্যে 'অপরাজিত' এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এ' উপন্যাসের দোষগুণ বিচার ক'রে রায় দেবার আগে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ' কাহিনীর নায়ক সাধারণ মানুষ নয়।

সে মহাপুরুষ নয় বটে, কিন্তু সে এক বিচিত্র চরিত্র। জীবন-পিপাসা, প্রেমানুভূতিও বাস্তব-চেতনা—তার মত সূক্ষ্ম সংবেদনশীল কবি ও দার্শনিক প্রকৃতির মানুষের পক্ষে একটু স্বতন্ত্র ও বিচিত্র হবে নিশ্চয়ই। আর সেটাই স্বাভাবিক। তবে হয়ত জীবনধর্মী উপন্যাসে তার যে স্বল্পতম মাত্রাটুকু রক্ষা করা উচিত, অপুর মধ্যে কোথাও কোথাও তা'ও বোধ হয় রক্ষিত হয়নি। অথবা জীবনের নিবিড় তীব্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সেই বোধগুলি সর্বত্র বিকশিত হয়ে ওঠে নি।

তবে এসব অভিযোগের দ্বারা আমরা অপুকে জীবন্-পলাতক এক স্বপ্ন-সর্বস্ব কল্পনাবিলাসী চরিত্র বলে চিহ্নিত করছি, একথা যেন কেউ না মনে করেন। অপু এই পৃথিবীর 'বাস্তব' জীবন থেকে কোনদিন পালিয়ে যেতে চায় নি। তার চরিত্রের বিশিষ্টতা এখানে যে, জীবনের তথাকথিত এই 'বাস্তবতা'কে সে একমাত্র বলে স্বীকার ক'রে নেয় নি। সে জীবনের গভীরেও প্রবেশ করতে চেয়েছিল। সেই গভীরতর মহত্তর জীবনের সাধক অপু-চরিত্রের গঠন পদ্ধতিতে আর যে ত্রুটি-ই থাক, সে চরিত্রকে একেবারে 'জীবন-পলাতক' বা 'অবাস্তব' আখ্যা দেওয়া একান্ত অসঙ্গত।

অপুর সারাজীবনের যে গভীর উপলব্ধি, কাহিনীর শেষে যে মহৎ বিশ্বচেতনা—তা জীবনের বিচিত্র তীব্র ঘটনার উত্তরঙ্গ সমুদ্র পেরিয়ে না আসতে পারে, কিন্তু এ-ও সত্য যে অপুর সে-উপলব্ধি পুঁথি-পড়ার ফল নয়, জীবন-অনুভবেরই স্বাভাবিক পরিণতি। সে কর্মী নয়, ভাবুক। কর্ম বা ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠক মনে হয়ত সে উপলব্ধিগুলি সর্বত্র জাগেনা, কিন্তু অপুর ভাবসমৃদ্ধ হৃদয়ে জাগে। তাই উপন্যাসের মধ্যে চরিত্র-সৃষ্টির যে স্বাভাবিক, objective, concrete পদ্ধতি আমরা আশা করি, অপু-চরিত্র সব সময় আমাদের সে আশা পূর্ণ করে না একথা সত্য, কিন্তু তার অর্থ এ' নয় যে এমন চরিত্র-পরিকল্পনাই বিভূতিভূষণের অবাস্তব, জীবন-পলাতক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক!

উপন্যাসের 'অপরাজিত নামের সার্থকতা পাঠক উপলব্ধি করেন কাহিনীর একেবারে শেষে পৌঁছে। এই নামের যে অর্থ বাইরে থেকে, বই না পড়েই প্রতীয়মান হয়, আসল অর্থ ঠিক তা নয়। অপু ব্যক্তিগতভাবে জীবনের সব আপদ-বিপদের মধ্যেও পরাজয় স্বীকার করে নি, বরং শেষ পর্যন্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল—এই অর্থে এই কাহিনীর 'অপরাজিত' নামের প্রকৃত সার্থকতা নয়।

উপন্যাসের একেবারে শেষে লেখক নিজেই এর নামের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে গেছেন। অপু বিদেশে যাবার আগে কাজলকে নিয়ে গেল নিশ্চিন্দিপুরে। তার শৈশবতীর্থে। সেখানে তারই শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদির হাতে কাজলকে সমর্পণ করল।

অপু চলে যাবার পর এক নির্জন দুপুরে শিশু কাজল নিজের অজ্ঞাতসারে তারই পিতা-পিতামহের পুরনো ভাঙা ভিটেয় এসে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে যেন অপুর শৈশবের সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত স্মৃতি কাজলের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল স্বপ্নের মত।

"এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙারে বীরু রায়, ঠাকুর্দাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা * * * * প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি……।"

কাজলের মধ্য দিয়ে শিশু অপু যেন আবার পুনর্জীবিত হয়েছে নিশ্চিন্দিপুরের সেই স্বপ্ন-নির্জন পরিবেশে জীবনের এই রহস্যময় গতি-চেতনায় অভিভূত হয়ে লেখক তাই বলে উঠেছেন: "যুগে যুগে অপরাজিত জীবন রহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে।"

অপুকে লেখক 'অপরাজিত' বলতে চা'ন নি। হরিহর-অপু-কাজলের বংশানুক্রমের ধারাতে জীবনের এই ক্রম-প্রসারিত বিশাল রহস্য-রূপকেই তিনি 'অপরাজিত' বলেছেন। উপন্যাসের এই সমাপ্তি পর্বের পরিকল্পনার মধ্যে কেবল নামকরণের তাৎপর্য নয়, লেখকের এক অসামান্য শিল্প-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অপুর স্বপ্নদর্শী মনে একদিকে যেমন ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নকল্পনা, অনাগত জীবনের অনুভব-তৃষ্ণা, (যার আকর্ষণে সে সুদূর ফিজি দ্বীপে যাত্রা করেছিল) অন্যদিকে তেমনি ছিল

অতীতের স্মৃতিলোকের প্রতি এক নিবিড় আকর্ষণ। একে বলা য়েতে পারে তার nostalgic অনুভূতি। এই অনুভূতিকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য লেখক অপুর সঙ্গে তার শৈশব-সহচরদের বারবার দেখা করিয়েছেন। পটু, সুরেশ্বর, লীলাদি, রাণুদি,—উত্তরকালে আবার এদের দেখা পাওয়া মাত্র অপুর মন এক বিচিত্র আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে ভরে উঠেছে। ছোটবেলার সেই হারানো দিনগুলির জন্য তার মন অকারণ ব্যথায় অশ্রুসিক্ত হয়েছে বারবার।

সব শেষে, এই নিবিড় nostalgia-ই অপুকে যেন আবার ডাক দিয়ে নিয়ে গেছে নিশ্চিন্দিপুরের নির্জন স্মৃতি-বিহ্বল জগতে। সেখানে তার থাকা হ'ল না বটে, কিন্তু কাজলকে সে সেখানে রেখে এল। তারি মধ্য দিয়ে সে সারাজীবন, এমন কি মৃত্যুর পরেও নিশ্চিন্দিপুরের আকাশের তলায়, সোনাডাঙার মাঠে মাঠে, আস-শ্যাওড়া ঘেঁটুফুলের বনে বনে, চিরদিন বেঁচে থাকবে।

কাহিনীকে এইভাবে লেখক যে একটি পূর্ণ বৃত্তরূপ দিতে চেয়েছেন, নিশ্চিন্দিপুরের শিশুকে আবার অভিনব উপায়ে নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতেই ফিরিয়ে এনেছেন—এটি তাঁর অত্যাশ্চর্য রসসৃষ্টি ও শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'—অপুর এই দুই 'জীবনে'র কাহিনীকে লেখক এক সূক্ষ্ম কৌশলে যুক্তবেণী করে দিয়ে উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটিকে আরও নিবিড় অচ্ছেদ্য করে তুলেছেন।

এই উপন্যাসের কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির ওপর আলোকপাত করেছি। কিন্তু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও 'অপরাজিত' বাঙালী পাঠকের কাছে একান্ত প্রিয়। 'অপরাজিত'-র এই জনপ্রিয়তা, নানা কারণে। এর গল্পরস, এর অন্তর্নিহিত একান্ত মৌলিক ও অভিনব জীবনদৃষ্টি, অপুর নির্লিপ্ত অন্তর্মুখী নির্জন কবি-প্রকৃতি—উপন্যাসটিকে বাঙলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট এক আসন দান করেছে।

'অপরাজিত' উপন্যাসের দু'টি অসামান্য সম্পদের কথা উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, লেখকের প্রতিও অবিচার করা হ'বে। একটি সর্বজয়া-চরিত্র, অন্যটি অপু-অপর্ণার কাহিনী। অপুর অন্তর্জীবনে তিনজন নারীর প্রভাব অপরিসীম। দিদি দুর্গা, মা সর্বজয়া ও স্ত্রী অপর্ণা।

দুর্গা ও মায়ের প্রসঙ্গ 'পথের পাঁচালী'তে আছে। গ্রন্থেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সর্বজয়ার কাহিনী 'অপরাজিত'-র প্রায় অর্ধপথ অবধি প্রসারিত হয়ে আছে। সর্বজয়া চরিত্রের বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে 'চরিত্র-চিত্রণ' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অপর্ণা-উপাখ্যান এই উপন্যাসের একটানা কাহিনীর মধ্যে এক বিচিত্র করুণ-মধুর আস্বাদ এনে দিয়েছে। অপর্ণার সঙ্গে অপুর আকস্মিক বিবাহ—অপুর জীবনের প্রচলিত ধারাকে আমূল পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। অপর্ণার মধ্য দিয়ে জীবনের গোপন রহস্যমধুর এক দিগন্ত তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সহায়-সম্পদহীন জীবনে হঠাৎ অপর্ণার আবির্ভাবে অপু একদিকে যেমন নিজেকে একান্ত বিড়ম্বিত বোধ করেছিল, তেমনি আবার সেই অকূল অশান্ত জীবন-সমুদ্রে একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয় জেনে পরম তৃপ্তি-ও পেয়েছিল। ছোটখাটো, তুচ্ছ নানা আনন্দ-বেদনার ঘটনার মধ্য দিয়ে অপু জীবনের এক পরম অর্থ আবিষ্কার করেছে। অপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে মনসাপোতা যাবার পথে ষ্টেশনের ধারে দু'জনের প্রথম গৃহস্থালী পাতার সেই সংক্ষিপ্ত ছবি অপুর অন্তর্লোকে জীবন-রসের এক নূতন স্বাদ, বেঁচে থাকার এক অভিনব তাৎপর্য এনে দিয়েছিল সেদিন। তারপর মনসাপোতায় ও কলকাতায় তাদের ঘর-সংসারের শান্ত শুচিস্নিগ্ধ জীবন—অপুর উদাসীন, ঘরছাড়া মনের উপর গভীর অথচ সম্পূর্ণ অভিনব এক রেখাপাত করেছে। অপর্ণা-কাহিনী থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অপুর প্রকৃতি উদাসীন ও অন্তর্মুখী হ'লেও সে সম্পূর্ণভাবে ভবঘুরে যাযাবর স্বভাবের মানুষ নয়। সমসাময়িক 'কল্লোল' যুগের বহু উপন্যাসে,—এই যাযাবর, 'বোহেমিয়ান' ধরণের নায়কের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল। যোহান বোয়ার, নুট হামসুন-প্রভাবিত ও 'Vagabonds', 'Hunger'-এর নায়কদের অনুকরণে রচিত এই মানুষগুলি গৃহহীন আত্মীয় পরিজনহীন এক অবাস্তব রোম্যান্টিক জগতের পথিক। বিভূতিভূষণের 'অপু' তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে আপন প্রাণের প্রেরণায় পথে বেরিয়ে পড়ে বটে, পথের দুর্নিবার নেশা তাকে ঘরছাড়া করে সত্য—কিন্তু এই মর্ত্যলোকের প্রতি, মানুষের স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘেরা গৃহ-জীবনের প্রতি তার আকর্ষণও কম নয়। অপুর এই বিশুদ্ধ মর্ত্যজীবনরস-প্রীতি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে একটিবারও যদি কোথাও প্রকাশ পেয়ে থাকে,

তবে সে এই অপর্ণার সঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত গৃহজীবনচর্যার দিনগুলিতে। একথা নিঃসংশয়ে সত্য।

জগতে কোন রচনাই একেবারে ত্রুটিহীন নয়। মানুষের প্রতিভা যত মহৎ-ই হ'ক, তবু তার সীমা আছে। সেই সীমিত প্রতিভার সৃষ্টিতে কোন-না-কোন ত্রুটি থাকবে—এই ত' স্বাভাবিক। 'অপরাজিত'-ও ত্রুটিহীন রচনা নয়। কিন্তু সে সব নিয়েও 'অপরাজিত' মহৎ সৃষ্টি। 'অপরাজিত' কেন রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' হ'ল না এ' নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসে ক্রিস্তফের যে তীব্র জীবন-পিপাসা ও প্রবল প্রাণধর্মের প্রকাশ আছে, অপু চরিত্রে তা নেই একথা সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে অপু ও ক্রিস্তফ এক গোত্রের মানুষ নয়। তা'র দুজনেই হয়ত জীবনের অন্তর্লীন রহস্য ও পরমসত্যকে জানবার জন্য অধীর হয়েছিল—কিন্তু তাদের পরিবেশ ও প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য—তাদের জীবনরহস্য অন্বেষণের পদ্ধতি ও রূপও বিভিন্ন হয়েছে। একথা হয়ত সত্য যে অপু চরিত্রের মধ্যে জীবন-পিপাসার তীব্রতা আরও কিছুটা থাকলে উপন্যাস হিসেবে 'অপরাজিত'-র ঐশ্বর্য ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত।

কিন্তু কী পাইনি এর জন্য খেদ করতে গিয়ে, যা পেয়েছি তার সত্যমূল্য যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

'অপরাজিত' সত্যই মহৎ সৃষ্টি। তবে একটা কথা। 'অপরাজিত' নিজে ব্যর্থ নয়, কিন্তু এরই মধ্যে বিভূতিভূষণের উত্তরকালের অন্যান্য একাধিক অসফল উপন্যাসের ব্যর্থতার বীজ নিহিত আছে। অপুর উদাসীন দার্শনিক প্রকৃতির পক্ষে যে গাঢ় জীবন-পিপাসার অভাব তেমন অসঙ্গত বোধ হয় না, সেই অভাবই লেখকের একাধিক উপন্যাসে বিপর্যয় ঘটিয়াছে। 'বিপিনের সংসার', 'অথৈ জল', 'কেদাররাজা' প্রভৃতি উপন্যাসের কথা এখানে স্মরণ করছি। এই সব উপন্যাসে লেখক যে বিষয়বস্তু বিন্যাস করেছেন, তাকে সার্থকরূপ দিতে গেলে যে নিবিড় ও তীব্র বাস্তব জীবনবোধের প্রয়োজন, অপু-চরিত্রের স্রষ্টা, উদাসীন নির্লিপ্ত প্রাণ বিভূতিভূষণের মধ্যে তার অভাব

ছিল। তার ফলে 'অপরাজিত'-য় যে বোধের অভাব পাঠককে পীড়া দেয়নি, পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে সেই অভাবই মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' কিংবা 'অপরাজিত' রচনা করে বিভূতিভূষণ ঔপন্যাসিক হিসেবে যে প্রতিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তি রচনা করেছিলেন, সেই অচল প্রতিষ্ঠায় কিছুটা ফাটল ধরিয়েছে ওই রচনাগুলি।

'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যকে'র পূর্ণ সাফল্য, 'অপরাজিত'-র আংশিক সার্থকতা ও পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলির ব্যর্থতা থেকে এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ঔপন্যাসিক হিসেবে বিভূতিভূষণ এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর স্রষ্টা, তাঁর অভিজ্ঞতা ও বোধের জগৎ উপন্যাসের সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট পথ থেকে অনেকখানি পৃথক।

॥ আরণ্যক ॥

একটা কথা গোড়াতেই স্বীকার করে রাখি। 'আরণ্যক' বিষয়ে এ' আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনা ও চরিত্র চিত্রণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেখানে আলোচনা করেছি, সেখানে স্বভাবতঃই 'আরণ্যক' সম্পর্কে নানা কথা বলতে হয়েছে। এ ছাড়াও লেখকের অতি-প্রাকৃত-প্রবণতা সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গেও ('বৈচিত্র্যধর্ম' অধ্যায়ে) 'আরণ্যকে'র কথা অপরিহার্যভাবেই এসে পড়েছে। পুনরুক্তির আশঙ্কায় বর্তমান আলোচনায় সে সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলতে চাইনে। 'আরণ্যক' সম্পর্কে অতিরিক্ত যে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন, তাই এখানে বলব। তার ফলে স্বভাবতঃই এখানে 'আরণ্যক' সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই বাদ পড়বে। তবে প্রসঙ্গক্রমে অনিবার্যভাবে হয়ত পূর্বে বর্ণিত কথা কিছু কিছু এসে পড়তেও পারে।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হ'বার ন' দশ বছর পরে 'আরণ্যক' বেরুল। বাংলা ১৩৪৫ সালে। এ গ্রন্থ প্রকাশের পরেও বাঙলাদেশের মানুষ আর একবার বিস্মিত হয়েছিল বিভূতিভূষণের প্রতিভার মৌলিকতায়, তার অভিনবত্বে। 'পথের পাঁচালী'র মতো উপন্যাসও যেমন তাদের ধারণার অতীত ছিল, তেমনি, কিংবা বোধ হয় তার চেয়েও বেশী অপ্রত্যাশিত ছিল 'আরণ্যক'। আরণ্যকের পটভূমি, এর বিচিত্র নরনারী সম্পর্কে বাঙালী সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল বলা যেতে পারে। সেই অচেনা অথচ একান্ত বাস্তব জগতের কাহিনীকে বিভূতিভূষণ যেদিন আশ্চর্য শিল্পরূপ দান করলেন, সেদিন বাঙালী পাঠক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

'পথের পাঁচালী' আমাদের কাছে যত অসামান্য, যত অভিনব বলেই মনে হ'ক না কেন, আসলে 'পথের পাঁচালী'র পটভূমি আমাদের অত্যন্ত চেনা-জানা। পরিচিত দৈনন্দিন জীবনের ছবি 'পথের পাঁচালী'তে পর্যাপ্ত ছড়ানো রয়েছে, তাছাড়া লেখকের বিস্ময়কর দৃষ্টির আলোয় 'পথের পাঁচালী'র ঘটনাগুলি চিরন্তন জীবনের সৌন্দর্য-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু

তবু সেখানে বাঙালীর ঘরোয়া পারিবারিক জীবনের একটা মধুর ছবি মেলে, বাঙালী সমাজ সেখানে একেবারে অনুপস্থিত নয়।

কিন্তু 'পথের পাঁচালী' থেকে 'আরণ্যক' যেন অনেক দূরের পথ। এ উপন্যাসে বাঙলা দেশ নেই, তার সামাজিক, পারিবারিক কোন পরিচিত পরিবেশের চিহ্নমাত্র এখানে চোখে পড়ে না। দিক্‌দিগন্তব্যাপী নির্জন অরণ্য-সমাবৃত এ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত রহস্য-নিবিড় যাযাবব জীবন-পবিবেশ। বাঙলা দেশ থেকে মাত্র কয়েক শ' মাইল দূরে এমন রহস্যময় অপরিচিত জগৎ আছে—যেখানে আজও সেই অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আদিম পৃথিবী ও জীবন-পরিবেশ বেঁচে রয়েছে,—এই আশ্চর্য উপলব্ধি বিভূতিভূষণের আগে আব কেউ আমাদের কাছে বহন ক'রে আনেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় বর্ণিত সমুদ্র-মেখলা সেই নির্জন জনহীন রহস্য-মেদুর অরণ্যচিত্রের পব বাঙলা উপন্যাসে এমন নির্জন রহস্য-গম্ভীর অভিনব নিসর্গ পরিবেশও আর চোখে পড়েনি।

বাঙালী পবিবাব ও সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক রহিত হ'তে পারে, কিন্তু আসলে এ' পরিবেশও ত' অবাস্তব অলৌকিক কোন জগৎ নয়। লেখক নিজেও বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়, "আবণ্যকের পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়," বাঙলা দেশ থেকে মাত্র কয়েক শ' মাইল দূরে বিহারের ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত এক বিশাল অরণ্য-অঞ্চলে লেখক নিজে একবার গিয়েছিলেন চাকরী নিয়ে। সেখানকাব প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনীই কল্পনায় সমৃদ্ধ হয়ে 'আরণ্যক' রূপ নিয়েছে।

কেবল কল্পনা আব অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে উপন্যাস লেখা চলে না। 'আরণ্যকে'র মতো উপন্যাস ত' নয়ই। কিন্তু বিভূতিভূষণ কেবল লেখনী-জীবী শিল্পীই ছিলেন না, তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল বেপরোয়া ভ্রাম্যমাণ ভবঘুরে এক মানুষ। সারা জীবন তিনি অরণ্যে পর্বতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মানুষ ও প্রকৃতিব সৌন্দর্য ও রহস্য সন্ধানে। আর তাঁর সেই দুর্গম জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণে বাঙলা উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দুইই সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশ-বৈচিত্র্যে, বিষয়বস্তুর মৌলিকতায় ও সর্বোপবি শিল্পরসের আস্বাদে 'আরণ্যক' ভারতীয় সাহিত্যে ত' বটেই, বিশ্বসাহিত্যেও অনন্য।

উপনিষদের আর এক নাম 'আরণ্যক'। উপনিষদের অর্থ 'রহস্যগ্রন্থ',

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' গ্রন্থেও দেখি অরণ্যের গহন গভীর সৌন্দর্যরহস্য ধীরে ধীরে পাঠক চিত্তকে বিহ্বল করে তুলেছে। এই কাহিনীর যিনি সূত্রধার, তিনি নাগরিক পরিবেশে লালিত উচ্চশিক্ষিত যুবক। সুতরাং তাঁর চোখে ওই বন্য আদিম অসম্বৃত প্রকৃতি প্রথমে বিতৃষ্ণা ও ভয়, তারপর ক্রমশঃ বিস্ময়-বিহ্বল রোমান্টিক পিপাসা জাগিয়েছে। সবশেষে এই প্রকৃতির অন্তর্লীন অতীন্দ্রিয় রহস্যচেতনা ওই মানুষটির মনকে আধ্যাত্মিক ও 'মিষ্টিক' বোধের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মর্মাশ্রয়ী এক নিবিড় অখণ্ড চৈতন্যশক্তির অনুভবে তাঁর হৃদয় শান্ত হ'য়েছে। ওই নিবিড় অরণ্য-প্রকৃতিকে তাঁর মনে হয়েছে যেন কোন এক মহান্ কবির আশ্চর্য শিল্প-রচনা। উপনিষদের ঋষির মতো তিনিও যেন সমস্ত পাঠককে আহ্বান করেছেন সেই নিবিড় শাশ্বত সৌন্দর্যের রহস্য-রসে অবগাহন করার জন্য :

'পশ্য দেবস্য কাব্যম্ ; ন মমার ন জীর্যতি।'

শুধু প্রকৃতি নয়, 'আরণ্যকে' ওই আরণ্যপ্রকৃতির কোলে লালিত মানুষের কাহিনীও আছে। অরণ্যের জটিল অন্ধকারের মধ্যেও লেখক আলোর রেখা দেখতে পেয়েছেন। সে আলো প্রাণের। মানবপ্রাণের, মনুষ্যত্বের। অসংখ্য বিচিত্র নরনারী 'আরণ্যকে'র বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে, অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন সরলবিশ্বাসী গণু মাহাতো, উদাসীন ধার্মিক প্রকৃতির রাজুপাঁড়ে, টোলের পণ্ডিত মটুকনাথ, গ্রাম্যকবি বেঙ্কটেশ্বর, সৌন্দর্যরসিক পাগল প্রকৃতির যুগল প্রসাদ, নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া, অর্থ ও ক্ষমতালোলুপ রাসবিহারী সিং, বাইজীর মেয়ে দুঃখিনী কুন্তা, মঞ্চী ও অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী—সকলে মিলে অরণ্য জীবনের কাহিনীকে সজীব ও বাস্তব করে তুলেছে। অরণ্য যে কেবল রহস্যগম্ভীর নয়, তারও মধ্যে মানব-জীবনের সুখদুঃখ হাসি-কান্নায় ভরা প্রতিদিনের একটি বাস্তব সচল প্রবাহ আছে, এই সত্যের দিকে বিভূতিভূষণই প্রথম বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রকৃতি ও মানুষের এই মিলিত কাহিনীর মধ্য দিয়ে 'আরণ্যক' গ্রন্থে লেখকের রোম্যান্টিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর এক সার্থক সমন্বয় হয়েছে। 'আরণ্যকে'র কাহিনী যে পটভূমি আশ্রয় করে রচিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের মনে একটি রোম্যান্টিক বিস্ময় ও দূরত্ববোধ আছে। তাই সে

জীবনের কাহিনীকে লেখক ঠিক সেইভাবেই রচনা করে পাঠকের মনোরঞ্জনের দ্বারা সুলভ প্রশংসা হয়ত' পেতে পারতেন। কিন্তু প্রতিভাশালী মৌলিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক সম্পূর্ণ অভিনব এক পথ অবলম্বন করলেন। তিনি অরণ্যের রহস্য বিস্ময় ও গভীর গম্ভীর রূপটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেও তার বাস্তব জীবনচিত্রটি, সেখানকার মানুষের প্রাত্যহিক রূপটিকে আমাদের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটিয়ে তুললেন। বাস্তবতা ও রোম্যান্টিক বিস্ময়ের এমন সহজ সমন্বয়—লেখকের প্রতিভার অসামান্যতার পরিচায়ক। পাশ্চাত্য সমালোচক J. W. Beach ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-চেতনার মধ্যে এই দ্বিমুখী সত্তা অনুভব করে তাকে 'Janus-thinker' আখ্যা দিয়েছিলেন। 'আরণ্যক' স্রষ্টা বিভূতিভূষণকেও আমরা ওই বিশেষণে অলংকৃত করতে পারি। সরস্বতী কুণ্ডীর পরিবেশ-বর্ণনা কিংবা মেলায় যাওয়ার সময় পথের বর্ণনার মধ্যে দেখি, সেখানে বর্ণনার প্রতিটি রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব। অথচ সব মিলিয়ে সে ছবির স্বপ্নময় রোম্যান্টিক অনুভূতি আমাদের মনকে মুগ্ধ করে।

অরণ্যের মধ্যে খর নিদাঘের চিত্র, ভয়াবহ জলকষ্ট, দাবানল, কলেরা মহামারীর বর্ণনা ও ফসলকাটার পর ফুলকিয়া বইহারের মেলার ছবি অরণ্যের বাস্তব মূর্তিটিকে যেন আরও জীবন্ত করে তুলেছে।

ভানুমতী-উপাখ্যানে বাস্তব ও রোমান্সের এই সমন্বয় একটি অত্যন্ত মধুর ও রসোত্তীর্ণ রূপ নিয়েছে। ভানুমতীকে ঘিরে শিক্ষিত বাঙালী তরুণ মনের ঈষৎ স্বপ্নমোহ, পাহাড়ের ওপর ভানুমতীর পূর্বপুরুষের সমাধিভূমিতে নির্জন অপরাহ্ণে একসঙ্গে দু'জনের ফুল দিতে যাওয়া, জ্যোৎস্নারাত্রিতে সহচরীদের সঙ্গে অনার্য রাজকুমারীর ঝুলন নৃত্য ও গীত—সব মিলিয়ে একটি রোম্যান্টিক কাহিনীর স্বপ্নজাল রচিত হয়েছে যেন। অথচ লেখক একথাও বিস্মৃত হ'ননি যে ভানুমতী আসলে এক বন্য অশিক্ষিত সাঁওতাল-দুহিতা। তার পরিবার পরিজনেরও যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাও বাস্তবতার মর্যাদাকে কোথাও লঙ্ঘন করেনি।

বাস্তবে ও স্বপ্নে মেশানো এই অনার্য রাজকন্যার অপরূপ কথা, আমাদের কাছে রূপকথার মতই রসমধুর। এই অরণ্যলক্ষ্মীর কাহিনী 'আরণ্যকে'র মধ্যে বোধ হয় একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উপাখ্যান। এরই মধ্যে পাঠক প্রকৃত গল্পরসের আস্বাদ পায়। নচেৎ অন্য সমস্ত চরিত্রই লেখকের দৃষ্টিতে

বাস্তব চরিত্র মাত্র। তারা নিজেদের চারদিকে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ রসমধুর গল্পের জাল রচনা করে পাঠককে এমনভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি।

সমগ্র গ্রন্থটিতে অখণ্ড সংহত একটি মাত্র ঘটনা বা plot নেই। ক'লকাতা সহর থেকে এক বাঙালী তরুণ ম্যানেজার ভাগলপুরের নিবিড় অরণ্যদেশে এসেছিল কর্মোপলক্ষে। সেখানে প্রথম পৌঁছানোর দিন থেকে বিদায়ের শেষদিন পর্যন্ত ওই যুবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। ধীরে ধীরে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং একের পর এক অসংখ্য চরিত্র মিছিলের মতো তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের পথ বেয়ে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়েছে। সবই যেন এক একটা মানুষের "প্রোফাইল" (Profile)। হয়ত' প্রোফাইল বা স্কেচ্-এর চেয়ে অনেক সামগ্রিক দৃষ্টিতে, অনেক গভীর অন্তরঙ্গতায় লেখক তাদের উপলব্ধি করেছেন, পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু একথা ঠিক, এই মানুষগুলি পরস্পরের সঙ্গে কোথাও সংযুক্ত, সম্পৃক্ত নয়। এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত ঘটনা এবং মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র। অন্য মানুষ বা ঘটনার সঙ্গে তাদের কোন গভীর মৌলিক যোগ নেই। ফলে সমস্ত চরিত্র ও কাহিনীকে এই অরণ্যের মরুভূমিতে শিথিলগ্রন্থি অথচ একটানা caravan বা মিছিলের মতো মনে হয়।

এই সব কারণে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, 'আরণ্যক' আদৌ উপন্যাস কিনা, নাকি, একধরণের ভ্রমণকাহিনী বা ডায়েরী। যাঁরা একথা বলেন তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হ'ল, এ' গ্রন্থে একটানা কোন সুসংবদ্ধ কাহিনী নেই। বইখানি পড়তে পড়তে নাকি মনে হয়, কোন এক পর্যটকের ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প পড়ছি। দিনের পর দিন ঘটনাগুলি বা চরিত্রগুলির সঙ্গে লেখক যে ভাবে একে একে পরিচিত হয়েছেন, তাতে মনে হয় যেন লেখক নিজের দিনলিপি অবলম্বন করেই এই কাহিনী লিখেছেন। কিংবা সমগ্র গ্রন্থখানিই যেন একটি বৃহৎ দিনলিপি। কেবল তার ওপরের সন-তারিখগুলি শুধু মুছে ফেলা হ'য়েছে। লেখক নিজেও এই ধরণের সমালোচনার আশংকা করেছিলেন। তাই আগে থেকেই স্পষ্ট ভাষায় সে কথা অস্বীকার করে গেছেন: "ইহা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস।"

ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে 'আরণ্যক' গ্রন্থের দুয়েকটি গৌণ সাদৃশ্য থাকলেও মূলগত প্রভেদও যথেষ্ট। ভ্রমণকাহিনীতে এলোমেলো অজস্র ঘটনা ও

প্রকৃতি-বর্ণনা থাকে বটে, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির অন্তর্লীন সজীব রহস্যময় সত্তাটি কখনও পাঠকের দৃষ্টির সামনে এমন অপরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে না। ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে লেখকের জীবনদর্শনের কোন স্পষ্ট পরিচয় থাকেনা কিন্তু মহৎ উপন্যাসে থাকে। 'আরণ্যকে'ও আছে। জগৎ ও জীবনের মধ্যে লেখক যে নিবিড় রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন, মানুষের সেবা, স্নেহ, প্রেম, হিংসা ও আদর্শের মূল্যবোধের যে পরিচয় লাভ করেছেন—তা' তাঁর জীবনদৃষ্টিকে স্পষ্টতর ও গভীরতর করেছে।

ভ্রমণকাহিনীতে সাধারণতঃ তথ্য-সংক্রান্ত নীরস খুঁটিনাটির ওপর অতিরিক্ত নজর দেওয়া হয়। কিন্তু 'আরণ্যক' সে ত্রুটি থেকে মুক্ত। এখানে লেখক ভ্রমণের খুঁটিনাটির ওপর ততখানি দৃষ্টি দেননি, যতখানি দিয়েছেন সৌন্দর্যের ওপর, মানুষের প্রাণ-রহস্যের ওপর।

ভ্রমণকাহিনী বা ডায়েরীর সঙ্গে আরণ্যকে'র আরেকটি মুখ্য সাদৃশ্যের কথা একটু আগেই বলেছি। একটানা ঐক্যবদ্ধ একটি কাহিনীর বদলে পরস্পর-বিশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র কতকগুলি ঘটনা বা চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এই গ্রন্থে।

এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এই ধরণের রচনায় এ' ত' খুবই স্বাভাবিক। অরণ্যে কোন সমাজ নেই, পারিবারিক সম্পর্কও সেখানে শিথিল। অধিকাংশ মানুষই সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী নয়। ফসলকাটা কি অন্য কোন কর্মোপলক্ষে তারা সেখানে আসে, কিছুদিন থাকে, তারপর আবার বাসা ভেঙে আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাযাবরের মতো পথে বেরিয়ে পড়ে। এইসব মরসুমী মানুষের কাহিনী তাই স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে বাধ্য। সমাজবদ্ধ মানুষের গল্পের মতো এ কাহিনীতে পরস্পরের মধ্যকার নিবিড় জীবন সংযোগ বা ঘাতপ্রতিঘাত দেখানো স্বাভাবিকও নয় সঙ্গতও নয়।

এ'ছাড়াও কথা আছে। 'আরণ্যক'-এর কাহিনী উত্তমপুরুষে বিবৃত। এর ফলে বিক্ষিপ্ত এলোমেলো ঘটনার মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধন ও সংহতি স্থাপিত হয়েছে। আরণ্যক জীবন শেষ হ'য়ে যাওয়ার পনেরো ষোল বছর পর গড়ের মাঠের একাংশে বসে স্মৃতি মন্থনের আলোকে সমগ্র ঘটনাগুলিকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলার ফলে ওই ঐক্যবন্ধন আরও যেন অন্তরঙ্গ ও নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। বক্তার স্মৃতিভারাতুর মনের করুণ মধুর স্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে এই কাহিনী ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরীর সমস্ত খণ্ড ও তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে উপন্যাসের রসলোকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তাহ'লে মেনে নেওয়া গেল, 'আরণ্যক' উপন্যাস। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর উপন্যাস? আগেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যে 'আরণ্যক' অনন্য। সম্পূর্ণ মৌলিক ও অভিনব এক সৃষ্টি। সুতরাং এর গোত্র নির্ণয় করা দুরূহ। এ' উপন্যাস সাধারণ প্রচলিত শ্রেণীর রচনা নয়। এর মধ্যে ভ্রমণকাহিনীর কিছু উপাদান আছে। ডায়েরীর লক্ষণও কিছু আছে। আর আছে আত্মকাহিনী বা স্মৃতিকথার উপকরণ। আমরা জানি বিভূতিভূষণ নিজে এই তিন শ্রেণীর রচনাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'আরণ্যকে' তিনি এই তিনটি আঙ্গিকের সমন্বয়ে উপন্যাস রচনার এক নতুন শিল্পপ্রকরণ তৈরী ক'রে' গেছেন। তবে মোটামুটিভাবে আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে, 'আরণ্যক'-কে আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

উপন্যাসের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হ'ল। কিন্তু 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কে? উপন্যাসে সাধারণতঃ একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকে। সে চরিত্র সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হ'ক, তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র আবর্তিত হয়। উপন্যাসের সমস্ত সুখ দুঃখ, আশা আনন্দের সঙ্গে এই চরিত্রের একটি মৌলিক সংযোগ থাকে। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত জীবনবোধ এই চরিত্রের মধ্য দিয়েই সার্থক আত্মপ্রকাশ লাভ করে।

'আরণ্যকে'র বাইরের ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র হিসেবে কাজ করেছে—সত্যচরণ নামে যুবকটি। সে ক'লকাতা থেকে অরণ্য-অঞ্চলে এসে এই জীবনের সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচিত হয়েছে। সে পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হ'য়েছে। এই উপন্যাসে সে তার সেই অতীত জীবনের নিবিড় অরণ্য-প্রেমের কাহিনী পাঠকের সামনে বিবৃত করেছে।

এদিক থেকে তাকে হয়ত ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যেতে পারে। কিন্তু তাকে এই কাহিনীর প্রকৃত নায়ক বলা যেতে পারে কি? সে ত' আসলে সূত্রধারের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সে ত' সমস্ত ঘটনার মধ্যে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো সংযোগ রক্ষা করেছে মাত্র। অরণ্য প্রকৃতি ও আরণ্যক মানুষের জীবনের সঙ্গে তার জীবনের অন্তরঙ্গ অনিবার্য যোগ কোথাও স্থাপিত হয় নি। বিশাল রঙ্গমঞ্চে দিনের পর দিন যে নাটকের অভিনয় হ'য়েছে সে যেন অন্তরাল থেকে ছায়ার মতো, নীরব সাক্ষীর মতো তা শুধু নিরীক্ষণ করেছে—প্রাণভরে সেই অমৃত পান করেছে। ওই অভিনয়ের মধ্যে তার নিজস্ব কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেই।

সুতরাং 'আরণ্যক' উপন্যাসের নায়ক-বিচার করলে দেখা যায় যে এখানে যদি কোন নায়ক থাকে তবে সে কোন মানব চরিত্র নয়—এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক, অরণ্য-প্রকৃতি ও আরণ্যক মানুষের জীবনলীলার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অরণ্যের গোপন আত্মা। লেখক সমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনা, খণ্ড চরিত্র ও সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেন অরণ্যের সেই রহস্যময় অদৃশ্য স্বরূপটিকে অনুধ্যান করতে চেয়েছেন। একদিকে আদিম অসম্বৃত শক্তি, অন্যদিকে স্নিগ্ধ মধুর সৌন্দর্য, একদিকে হিংসা স্বার্থ অন্ধসংস্কার, অন্যদিকে স্নেহ প্রীতি ও বৈরাগ্য—নানা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে লেখক যেন সেই 'Natura Naturans',—প্রকৃতির সেই মূল আত্মাশক্তিরই ধ্যান করেছেন এই উপন্যাসের সাধনভূমিতে।

'আরণ্যক' অরণ্য ভ্রমণের নিছক সাময়িক কাহিনী নয়, কিংবা প্রতিদিনের তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়,—সে যে মহৎ ধ্রুপদী সাহিত্য-কীর্তি, তার আর একটি বড় প্রমাণ, এর নিগূঢ় ইতিহাস-চেতনা।

বিভূতিভূষণ লবটুলিয়া আজমাবাদের বিশাল অরণ্য কিংবা মহা-লিখারূপের দূর-বিসর্পিত পর্বতমালার মধ্যে কেবল বর্তমানকে দেখেন নি, বর্তমানের সৌন্দর্যমোহে অভিভূত হ'ননি, তার মধ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতিভারাতুর মন সুদূর অতীত যুগকেও অনুভব করেছে। পাহাড় ও অরণ্যের সুপ্রাচীন রূপ তাঁর মানসদৃষ্টির সম্মুখে অতীত ইতিহাসের রহস্যময় জগৎকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছে। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' গ্রন্থেও আমরা বিভূতিভূষণের এই স্মৃতিচারণা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সেখানে অপু প্রধানতঃ নিজেকে কেন্দ্র করেই স্মৃতির জাল বুনে গেছে। তারই জীবনের পিছনের দিনগুলো তার কাছে বারবার ফিরে এসেছে—আশ্চর্য সূক্ষ্ম এক রস-সংবেদনা নিয়ে। 'আরণ্যকে' সেই স্মৃতি-অনুভব আর ততখানি ব্যক্তিগত নেই। তা একটি সর্বজনীন সাধারণ রূপ নিয়েছে। আত্মস্মৃতি এখানে সংহত ইতিহাস-চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

মহালিখারূপ পাহাড়ে ব'সে 'নায়কের' (!) মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছে—"কতকাল হইতে এই বনপাহাড়, এই একরকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এইরকমই ছিল।............সেই কতকাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, গ্রীকরাজ

হেলিওডোরাস গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্মাণ করেন।.........সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পালাইলেন, যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখারূপে ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিকএমনি ছিল।”—প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে এই সত্য অথচ সুমহান উপলব্ধি, এই ইতিহাস চেতনা ‘আরণ্যকে’র কাহিনীকে চিরন্তন মহিমা দান করেছে।

এই ইতিহাস-চেতনা উপন্যাসের নানা স্থানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। রাজা দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধি-ভূমি দর্শন করতে যাওয়ার পথে কিংবা ভানুমতী ও তার সহচরীদের ঝুলন নৃত্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে ‘নায়কে’র দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে ইতিহাসের ছায়াপথ: অনার্য সভ্যতার গৌরবদীপ্ত দিনগুলি কিংবা আর্যজাতি কর্তৃক অনার্যজয়ের সুদূর করুণ স্মৃতি।